আমাদের পৃথিবী

সপ্তম শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর, ২০১২
দ্বিতীয় সংস্করণ : অক্টোবর, ২০১৩
তৃতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৪

গ্রন্থস্বত্ব : পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রকাশক :
অধ্যাপিকা নবনীতা চ্যাটার্জি
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

মুদ্রক :
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সটবুক কর্পোরেশন
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

सत्यमेव जयते

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি **সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র** রূপে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিক যাতে : সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক **ন্যায়বিচার**; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার **স্বাধীনতা**; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের **সমতা** প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-সম্ভ্রম ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুনিশ্চিত করে **সৌভ্রাতৃত্ব** গড়ে তুলতে; **আমাদের গণপরিষদে**, আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, **এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি** এবং **নিজেদের অর্পণ করছি**।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE, social, econnomic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all – FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

ভূমিকা

সপ্তম শ্রেণির 'পরিবেশ ও ভূগোল' পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকটির নাম 'আমাদের পৃথিবী'। অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাষায় বইটিতে পরিবেশ আর মানবজীবনের পারস্পরিক সম্পর্কের নানা অভিমুখ আলোচিত হয়েছে। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা-২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন-২০০৯— এই নথিদুটিকে নির্ভর করে এই বৈচিত্র্যময় অভিনব পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-কে বিদ্যালয়স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলির সমীক্ষা ও পুনর্বিবেচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায়, নিরলস শ্রমে পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী সপ্তম শ্রেণির 'আমাদের পৃথিবী' বইটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

তথ্যভার যাতে শিক্ষার্থীকে উদ্বিগ্ন না করে সে বিষয়ে বইটিতে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ছবি, সারণি, তালিকা ব্যবহার করে ভূগোলের বিভিন্ন ধারণার সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটানো হয়েছে। আশা করি, রঙে রূপে চিত্তাকর্ষক এই বইটি শিক্ষার্থীমহলে সমাদৃত হবে।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিষয় বিশেষজ্ঞ ও অলংকরণের জন্য খ্যাতনামা শিল্পীবৃন্দ—যাঁদের নিরন্তর শ্রম ও নিরলস চেষ্টার ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ বইটির নির্মাণ সম্ভব হয়েছে, তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের সমস্ত বিষয়ের বই ছাপিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকে। এই প্রকল্প রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন নানাভাবে সহায়তা করেন এবং এঁদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

'আমাদের পৃথিবী' বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সকলকে মতামত ও পরামর্শ জানাতে আহ্বান করছি।

জুলাই, ২০১৪
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০১৬

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
প্রশাসক
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয় স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক- এর পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। পুরো প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE Act, 2009) নথিদুটিকে আমরা অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি সমগ্র পরিকল্পনার ভিত্তি হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে।

উচ্চ-প্রাথমিক স্তরে 'পরিবেশ ও ভূগোল' পর্যায়ভুক্ত বইগুলির মধ্যে সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক 'আমাদের পৃথিবী' প্রকাশিত হলো। এই পাঠ্যপুস্তকে 'ভূগোল' বিষয়টিকে মানবজীবন আর তার পরিবেশের নিরিখে পরিবেশন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর চেনা গণ্ডি অর্থাৎ তার বাড়ি, স্কুল, চারপাশের জগৎ থেকে ক্রমে ব্যাপ্ততর ভৌগোলিক ধারণার মধ্যে ধাপে ধাপে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নানা ধরনের হাতে-কলমে কর্মচর্চার মাধ্যমে যাতে শিক্ষার্থীর কাছে ভূগোলের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়গুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। নানান সরল মানচিত্র, বৈচিত্র্যে ভরা ছবি, ধারণা গঠনের লেখচিত্র, তথ্যমৌচাক প্রভৃতি অভিনব শিখন সম্ভারে বইটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে সামগ্রিক নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের (CCE) নানা ক্ষেত্র বইটিতে বিদ্যমান। সেসব সমীক্ষা আর সক্রিয়তা উত্তেজনা আর আনন্দে ভরপুর। আশা করি, ভূগোলের ধারণাগুলি শিক্ষার্থীর কাছে এইভাবে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা নির্ভর হবে। তাদের ব্যাখা করার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে। বইয়ের শেষে 'শিখন পরামর্শ' অংশে বইটির ব্যবহার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রস্তাবও মুদ্রিত হলো।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পাঠ্যপুস্তকটিকে অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভূত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করবো।

জুলাই, ২০১৪
বিকাশ ভবন
পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০০৯১

অভীক মজুমদার

চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

পুস্তক নির্মাণ ও বিন্যাস

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি)   রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্যসচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

রুবি সরকার

সৌমেন কর্মকার

অপর্ণা বেরা রায়চৌধুরী

শান্তনু প্রসাদ মণ্ডল

বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী

পরামর্শ ও সহায়তা

গিয়াসুদ্দিন সিদ্দিক

উত্তম মুখোপাধ্যায়

কল্যাণ রুদ্র

অবন্তী রাউত

পুস্তক সজ্জা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: শঙ্খ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রণ সহায়তা: বিপ্লব মণ্ডল

সূচিপত্র

প্রাকৃতিক ভূগোল

১। পৃথিবীর গতি (১)

২। ভূপৃষ্ঠের কোনো স্থানের (১৯)
অবস্থান নির্ণয়

৩। বায়ুচাপ (২৯)

৪। ভূমিরূপ (৩৭)

৫। নদী (৪৭)

৬। শিলা ও মাটি (৬১)

পরিবেশ ও মানুষ

৭। জলদূষণ (৬৭)

৮। মাটি দূষণ (৭৭)

আঞ্চলিক ভূগোল

৯। এশিয়া মহাদেশ (৮৩)

১০। আফ্রিকা মহাদেশ (১০০)

১১। ইউরোপ মহাদেশ (১১৯)

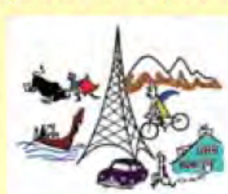

পৃথিবীর পরিক্রমণ

একটা বল হাতে নিয়ে ছেড়ে দিলে কী হবে?

—ঠিক ধরেছো। বলটা মাটিতে পড়ে যাবে। কারণ? পৃথিবীর ওপরে থাকা যে কোনো বস্তুকে পৃথিবী নিজের কেন্দ্রের দিকে টানে। এই জন্যেই তো আমরাও পৃথিবী থেকে ছিটকে যাই না,পৃথিবীর ওপরই থাকি। পৃথিবীর এই আকর্ষণ শক্তি হলো ___________।

ভেবে দেখেছ?

পৃথিবীও তো একটা ভারী গোলক। পৃথিবীও যদি ওই বলটার মতো পড়ে যায়, তাহলে আমাদের কি হবে? পড়ে যাওয়া মানেই তো শেষ পর্যন্ত কিছুর ওপর গিয়ে আছড়ে পড়া।

পৃথিবী তাহলে কোনদিকে, কোথায় গিয়ে আছড়ে পড়বে?

● ভেবে দেখো, ভারী, হালকা সব জিনিসই -'নীচের দিকে' পড়ে, তাইতো?

কিন্তু 'নীচের দিক' কোনটা?

• চারজনই বলবে যে,তার বলটা নীচের দিকে পড়ছে। এই 'নীচের দিক' হতে পারে নীচ থেকে, পাশ থেকে, ওপর থেকে — সবদিক থেকে!

কী কাণ্ড!!

ওপর থেকে কোনো জিনিস পৃথিবীর আকর্ষণের টানে নীচের দিকে পড়ে। তাহলে মহাশূন্যে কী হয়? মহাকাশেও কি আকর্ষণ কাজ করে?

• আসলে সব বস্তুই পরস্পরকে আকর্ষণ করে, বা নিজের দিকে টানে। এটা হলো মহাকর্ষ। এই টানাটানির খেলায়, যার 'ভর' বেশি, আর যে যত কাছে থাকে, তার আকর্ষণ তত বেশি হয়।

তাহলে কী হবে?

• পৃথিবী তাহলে কার দিকে আকর্ষিত হচ্ছে, কোনদিকে গিয়ে পড়বে? চাঁদের ওপর?

চাঁদতো পৃথিবীর থেকে ছোটো। তাহলে তারার ওপর? তারারা তো অনেক দূরে আছে। তাহলে সূর্যের ওপর?—হ্যাঁ, সূর্য সবথেকে কাছের তারা, আর পৃথিবীর তুলনায় ১৩ লক্ষ গুণ বড়ো। তাহলে পৃথিবী কি সূর্যের দিকে আকর্ষিত হচ্ছে? কিন্তু সূর্য যে জ্বলন্ত আগুনের গোলা!

বুঝেই দেখো ব্যাপারখানা

- খুঁটির মাথায় ঘুরন্ত চাকার সঙ্গে বাঁধা দড়ি ধরে দৌড়ানোর এক রকম খেলা আছে। খেলেছো কখনো? অথবা, মেলায় গিয়ে নাগরদোলায় চড়েছো?

- খুঁটি থেকে খানিকটা দূরে গিয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যদি পা দুটো মাটি থেকে তুলে, খুঁটিতে বাঁধা দড়িটা ধরে ঝুলতে চেষ্টা করো, তাহলে কী হবে?

—সোজা ছিটকে গিয়ে পড়বে খুঁটির গায়ে।

- কিন্তু যদি দড়ি ধরে ছুটতে ছুটতে একপাশে সরে গিয়ে, তারপর পা দুটো মাটি থেকে তুলে দাও, তাহলে?

—এবার খুঁটির চারিদিকে বন্ বন্ করে ঘুরতে থাকবে!

- মহাকাশেও অনেকটা এইরকম ঘটে। সূর্য হলো খুঁটি, আর তুমি পৃথিবী। পৃথিবী যদি এক জায়গায় স্থির থাকতো, তাহলে সূর্যের টানে সোজা গিয়ে পড়ত সূর্যের ওপর। কিন্তু সৃষ্টির সময়েই পৃথিবী সূর্য থেকে কিছুটা দূরে সরে যায়। আর তারপর থেকে **কোটি কোটি বছর ধরে সূর্যের আকর্ষণে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে**। মহাকর্ষের নিয়ম মেনে, এইভাবেই চাঁদও ঘুরছে পৃথিবীর চারদিকে। আর সূর্য? সূর্যও তার সৌরজগতের সব গ্রহ, উপগ্রহ সমেত আমাদের ছায়াপথ 'আকাশগঙ্গার' কেন্দ্রের চারিদিকে ঘুরছে!

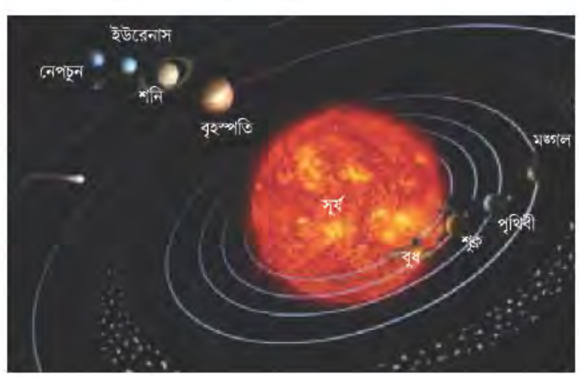

● পৃথিবীর পরিক্রমণ গতি বা বার্ষিক গতি

পৃথিবী শুধুই সূর্যের চারিদিকে ঘোরে না। লাট্টুর মতো পাক খেতে খেতে ঘোরে। নিজের 'অক্ষের' চারিদিকে একপাক ঘুরতে বা আবর্তন করতে পৃথিবীর সময় লাগে ২৪ ঘণ্টা। যে কল্পিত রেখার চারিদিকে পৃথিবী আবর্তন করে, সেটাই **পৃথিবীর অক্ষ (Earth's Axis)**।

পৃথিবীর যে দুটি প্রান্তে এই কল্পিত অক্ষদণ্ডটি বেরিয়ে থাকার কথা, সেই প্রান্তদুটি হলো **মেরু**। ওপরের প্রান্তটা উত্তর মেরু, আর নীচেরটা দক্ষিণ মেরু। আর দুই মেরুবিন্দু থেকে সমান দূরে, পৃথিবীর মাঝ বরাবর পৃথিবীর বিষুবরেখা বা নিরক্ষবৃত্ত। আমাদের দেশ রয়েছে নিরক্ষবৃত্ত এবং উত্তর মেরুর মাঝের অঞ্চলে অর্থাৎ উত্তর গোলার্ধে।

পৃথিবী নিজ অক্ষের ওপর আবর্তন করতে করতে, নির্দিষ্ট **উপবৃত্তাকার কক্ষপথে** পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে (ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে) নির্দিষ্ট সময়ে (প্রায় ৩৬৫ দিন) সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, বা পরিক্রমণ করে। এটাই পৃথিবীর পরিক্রমণ গতি। বার্ষিকগতি বা পরিক্রমণ গতির বেগ সেকেন্ডে প্রায় ৩০ কিমি।

জানো কী ?

কোনো বস্তুকে ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিলে বস্তুটা কিছুটা ওপরে উঠেও মাধ্যাকর্ষণ-এর টানে নীচের দিকে পড়ে যায়।

কিন্তু সব সময় তা নাও হতে পারে। অনেক বেশি জোরে ছুঁড়লে, অর্থাৎ বস্তুর গতিবেগ খুব বেশি হলে, তা পৃথিবীর মহাকর্ষীয় আকর্ষণ কাটিয়ে বাইরে চলে যেতে পারে। কোনো বস্তুকে প্রতি সেকেন্ডে ১১.২ কিমি গতিবেগে ওপরের দিকে ছুঁড়তে পারলে [একে বলে '**মুক্তিবেগ**' (**Escape Velocity**)] সেটা আর নীচের দিকে না পড়ে, মহাশূন্যে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরতে থাকবে। রকেটের মাধ্যমে কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা হয় এই মুক্তিবেগে।

পৃথিবীর কক্ষপথের উপবৃত্তটা কীরকম দেখতে?

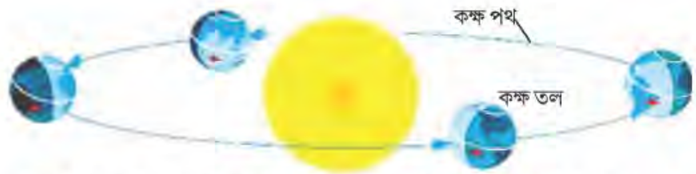

পৃথিবী প্রায় ১৫ কোটি কিমি দূর থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবী যে পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, সেটাই পৃথিবীর '**কক্ষপথ**'। এই কক্ষপথ মহাশূন্যে যে কাল্পনিক সমতলে অবস্থিত, সেটাই '**কক্ষতল**'।

জানলে ক্ষতি কী?

- বিজ্ঞানী কোপারনিকাসের সময় থেকেই জানা যায়— বিভিন্ন গ্রহগুলো সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। কিন্তু গ্রহগুলো ঠিক কীভাবে ঘোরে— এই সম্পর্কে বিজ্ঞানী কেপলার প্রথম গ্রহদের গতি সংক্রান্ত তিনটি সূত্র প্রণয়ন করেন।
- কেপলারের প্রথম সূত্রে বলা আছে— "**প্রতিটি গ্রহ উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং সূর্য ওই উপবৃত্তের একটি ফোকাসে থাকে।**"

- পৃথিবীর কক্ষপথের উপবৃত্তটা অনেকটা গোলাকার। তার সঙ্গে বৃত্তের পার্থক্য এতই সামান্য যে, কক্ষপথটা প্রায় বৃত্তের মতোই।

- একটা উপবৃত্তের দুটো অক্ষ। বড়ো অক্ষ (AB), আর ছোটো অক্ষ (CD)। কেন্দ্রবিন্দু 'O'।
- উপবৃত্তের কেন্দ্রের দুপাশে, সমান দূরত্বে বড়ো অক্ষের ওপর দুটো **ফোকাস** বিন্দু থাকে। (F, F_1)

- কিন্তু এই 'উপবৃত্ত' কীরকম হয়? 'বৃত্তের' সঙ্গে তার কতখানি পার্থক্য?

এঁকেই দেখো!

একটা পেনসিল, দুটো পিন, আর একটু সুতো লাগবে। সুতোর দুটো মুখে গিঁট দিয়ে লুপের মতো বানাও।

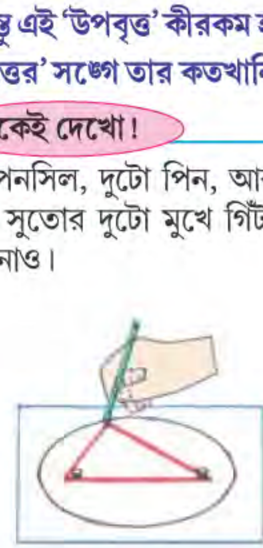

প্রথমে একটা কাগজের ওপর পিন দুটো ছবির মতো করে আটকাও। এবার সুতোর লুপটাকে কাগজের এপর এমনভাবে রাখো, যাতে লুপটা পিন দুটোকে ঘিরে থাকে। এবার লুপটার ভিতরের দিকে পেনসিলটা বসিয়ে লুপটাকে টান্‌টান্ রেখে কাগজের ওপর দিয়ে একপাক ঘুরিয়ে দাগ টেনে দেখো। কেমন লম্বাটে বৃত্ত হল! এটাই উপবৃত্ত।

- দুটো পিনকে কাছাকছি বা দূরে আটকে দিয়ে একইভাবে এঁকে দেখতে পারো। অনেকরকম উপবৃত্ত পাবে। কোনোটা ডিম্বাকার, কোনোটা খুব চ্যাপ্টা, লম্বা।

⇦ লক্ষ করে দেখো, কখন প্রায় **বৃত্তাকার** বা **গোলাকার** উপবৃত্ত হচ্ছে।

- উপবৃত্তাকার কক্ষপথের একটা **ফোকাসে** সূর্য অবস্থান করে। একারণে পৃথিবী সূর্য প্রদক্ষিণের সময় সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সবসময় সমান থাকে না। একসময়ে পৃথিবী সূর্যের বেশি কাছে আসে আবার একসময় দূরে চলে যায়।

কখন আমরা সূর্যের বেশি কাছে আসি?

- জানুয়ারি থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত পৃথিবী সূর্য থেকে ক্রমশ দূরে সরে যেতে থাকে।

- ৪ জুলাই সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সবচেয়ে বেশি হয় (প্রায় **১৫ কোটি ২০ লক্ষ** কিমি)। একে পৃথিবীর **অপসূর অবস্থান (Aphelion)** বলা হয়। আবার জুলাই থেকে বাকি ছমাসে দূরত্ব ক্রমশ কমতে থাকে।

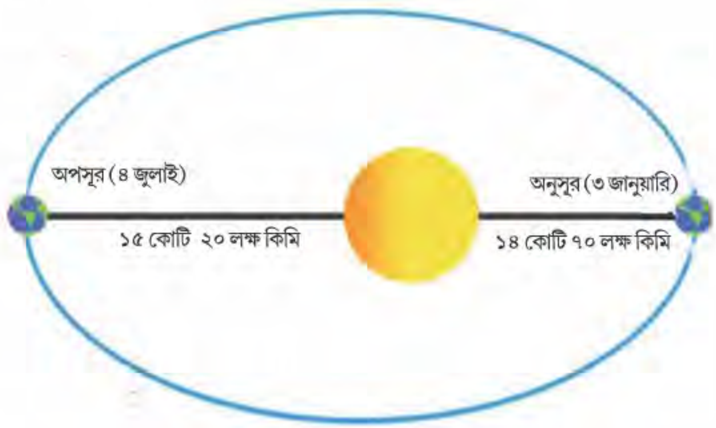

- ৩ জানুয়ারি সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সবচেয়ে কম হয় (প্রায় **১৪ কোটি ৭০ লক্ষ** কিমি)। একে পৃথিবীর **অনুসূর অবস্থান (Perihelion)** বলা হয়।

টিক্ টিক্ টিক্— সময় মাপো ঠিক!

সূর্যঘড়ি

ঢং ঢং ঢং করে ছুটির ঘণ্টা পড়ল! পরের দিন আবার ঠিক সময়ে স্কুল শুরু হবে, আর ঘণ্টা পড়ার আগে স্কুলে পৌঁছোতে হবে।

- ঘড়ি না থাকলে, সময়কে মাপার কোনো উপায় না থাকলে কি ঠিক সময়ে স্কুলে পৌঁছোতে পারবে?

- ঘড়ি থেকে তো কটা বাজে জানা যায়। কিন্তু কত তারিখ, কোন মাস, কোন বছর কী ভাবে জানা যায়? ঠিক ধরেছ, ক্যালেন্ডার! এই ক্যালেন্ডারে তারিখ, মাস, বছর সব ঠিক ঠিক কী করে লেখা থাকে ভেবে দেখেছ?

প্রাকৃতিক ঘড়ি

সময়কে মাপার তিনটে প্রাকৃতিক উপায় আছে।

প্রথম উপায়টা খুব সহজ। ২৪ ঘণ্টায় একবার করে দিন এবং রাতের পর্যায়ক্রম।

পৃথিবী নিজ অক্ষের ওপর ঘুরতে ঘুরতে কখনও সূর্য থেকে আমাদের আড়াল করে। আবার কখনও নিয়ে আসে সূর্যের আলোর দিকে। আসলে বিশাল একটা জাহাজের মতো পৃথিবীটা সূর্য কিরণের নীচে ধীরে ধীরে ঘুরছে। পৃথিবীর যে দিকটা সূর্যের দিকে থাকে, সেদিকে হয় দিন, বাকি অর্ধেকটায় তখন রাত-এর অন্ধকার।

দ্বিতীয় উপায়— পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ পৃথিবীকে প্রায় ২৮ দিনে প্রদক্ষিণ করে। এই সময়টাকে **'চান্দ্রমাস'** বলে। বর্তমানে ৩০ দিনে একমাস ধরা হলেও, কখনও ৩১ দিনে আবার ২৮ দিনেও একটা মাস হয়।

তৃতীয় উপায়টা — পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমণ। পৃথিবী সূর্যকে প্রায় ৩৬৫ দিনে একবার প্রদক্ষিণ করে। এই সময়টাকে **'সৌর বছর'** ধরা হয়। পরিক্রমণ গতির সময়কে ধরে বছর গণনা করা হয় বলেই একে 'বার্ষিক গতি'ও বলা হয়।

> **জানো কী?**
>
> সভ্যতার শুরু থেকে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ এভাবেই দিন রাতের আসা যাওয়া, চাঁদের বাড়া-কমা প্রভৃতি দেখে সময়ের হিসাব রাখার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে আরও বেশি নিখুঁতভাবে সময় মাপার প্রয়োজন হলো। ২৪ ঘণ্টার দিনকে ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ডে ভাগ করা হলো। এখন ঘড়ি দেখে অনায়াসে বলে দিতে পারো এই সময় কটা বেজে কত মিনিট, কত সেকেন্ড হয়েছে।

সূর্যঘড়ি বানিয়ে ফেলো

সমতল জায়গায় একটা সাদা কাগজ মাটিতে বিছিয়ে রাখো। একটা লম্বা লাঠি কাগজের মাঝখানে খাড়া করে পুঁতে দাও। এবার একটা রোদের দিনে সূর্য ওঠার ঠিক পরে লাঠির ছায়াটাকে দেখো। পেনসিল দিয়ে ছায়া বরাবর দাগ টেনে ফেলো। সূর্যাস্ত পর্যন্ত একঘণ্টা পর পর ছায়া বরাবর দাগ টেনে যাও। দাগগুলোর পাশে পাশে ঘড়ি দেখে সময়টাও লিখে রাখো। এবার দেখো, দিনের যেকোনোও সময়ে ঐ সূর্যঘড়িটা দেখেই তুমি সময় বলে দিতে পারবে!

- লক্ষ করে দেখো কখন লাঠির ছায়াটা সবথেকে ছোটো হয়?—(সকালে/দুপুরে/বিকেলে)
- কখন সবথেকে লম্বা হয়?—(সকালে/দুপুরে/বিকেলে)

বলো দেখি?

- সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবী কতবার নিজ অক্ষের ওপর আবর্তন করে?
- ১ দিনে বা ২৪ ঘণ্টায় কতগুলো মিনিট আছে?

সূত্র: ১ ঘণ্টায় ৬০ মিনিট আর ১ মিনিটে ৬০ সেকেন্ড হয়।

FEB
29

খেয়াল করেছ?

২৯ ফেব্রুয়ারি— তারিখটা কি প্রতিবছর ক্যালেন্ডারে পাও?
কিন্তু কোনো কোনো বছর ফেব্রুয়ারি মাসটা ২৮ দিনের বদলে ২৯ দিনে হয়।
তাহলে ২৯ ফেব্রুয়ারি কারো জন্মদিন হলে কি হবে?

কেন এমন হয়?

আমাদের ক্যালেন্ডারের এক বছর (৩৬৫ দিন) আর পৃথিবীর একবার সূর্য পরিক্রমণের সময় (এক 'সৌর বছর' ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড) একই হওয়া উচিত। কিন্তু হিসাবের সুবিধার জন্য ৩৬৫ দিনে একবছর ধরা হয়। ফলে প্রতিবছর এই ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড সময় বাড়তি থেকে যায়। এই বাড়তি সময়ের হিসাব ঠিক রাখার জন্য প্রতি চার বছর অন্তর একটা পুরো দিন (২৪ঘণ্টা) যোগ করা হয় ক্যালেন্ডারে। ঐ একদিন ফেব্রুয়ারি মাসের সঙ্গে যোগ হয়ে মাসটা ২৯ দিনের, আর বছরটা ৩৬৬ দিনের হয়। ৩৬৬ দিনের বছরকে বলে **অধিবর্ষ (Leap year)**।

জানো কী?
কাদের মাথায় অধিবর্ষের ব্যাপারটা প্রথম এল?
মিশরীয়রা প্রথম একটা অতিরিক্ত দিন যোগ করে হিসাব ঠিক রাখার উপায় আবিষ্কার করে!

কী করে বুঝবে?

যে সমস্ত বছরকে (যেমন ২০১২ সাল) '৪' দিয়ে ভাগ করলে, ভাগশেষ থাকবে না, সেই বছরগুলো 'অধিবর্ষ' হবে। কিন্তু আরও একটা ব্যাপার আছে। চার বছর অন্তর পুরো একটা অতিরিক্ত দিন ধরে নিতে থাকলে, কিছু সময় বেশি ধরে নেওয়া হয়। এই সমস্যা মেটাতে শতাব্দী বছরগুলোর (যেমন ১৯০০ সাল, ২০০০ সাল) জন্য অধিবর্ষের নিয়মটা একটু আলাদা করা হয়েছে। শতাব্দী বছরগুলোকে '৪০০' দিয়ে ভাগ করলে, ভাগশেষ না থাকলে, তবেই সেই বছর 'অধিবর্ষ' হবে।

এ তো খুব সহজ!
ঠিক ঠিক লিখে ফেলো

সাল	অধিবর্ষ হবে?
২০০৪	________
২০০০	________
২০১২	________
১৯০০	________
২০১৩	________
২১০০	________

● স্কুল থেকে ফেরার পথে সেদিন পিন্টু আর আলি একটা কাগজের ঠোঙার বল বানিয়ে খেলছিল। খেলতে খেলতে হঠাৎ আলির চোখে পড়ল— বল এর কাগজে সুন্দর একটা ছবি আর কী সব লেখা। ... কোনো বইয়ের পৃষ্ঠা হবে হয়তো।

এটুকু পড়েই আলির মাথায় একটা প্রশ্ন এল। সূর্য থেকে পৃথিবীতে প্রতিমুহূর্তে একই পরিমাণে আলো আর তাপ এসে পৌঁছোয়। তবেতো রোজই একই রকম গরম বা একইরকম ঠান্ডা পড়ার কথা। কিন্তু সারাবছর ধরে কখনো 'গরম', কখনো 'ঠান্ডা' এরকম হয় কেন?

● **আলির প্রশ্নের উত্তরটা খুঁজতে হবে তো?**

● **গ্রীষ্ম কেন শীতের থেকে গরম?**

সূর্য, পৃথিবীতে জীবনের উৎস। সূর্যের আলো, উত্তাপ ছাড়া বীজ অঙ্কুরিত হয় না, গাছপালা পল্লবিত হয় না। সমস্ত জীব জগৎ সূর্যের ওপর নির্ভরশীল।

সূর্যে প্রতিমুহূর্তে হাইড্রোজেন গ্যাস হিলিয়াম গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে বিপুল শক্তি তৈরি হচ্ছে। এই শক্তির ২০০ কোটিভাগের ১ ভাগ আলো এবং উত্তাপরূপে প্রতিমুহূর্তে পৃথিবীতে এসে পৌঁছোচ্ছে।

পৃথিবী নিজ অক্ষের ওপর ঘুরতে ঘুরতে উপবৃত্তকার পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীর অক্ষটা কিন্তু পৃথিবীর কক্ষপথের সাপেক্ষে পুরোপুরি লম্ব নয়, কিছুটা হেলানো (কক্ষতলের সঙ্গে ৬৬$\frac{১}{২}$° কোণে অবস্থিত)। তাই পৃথিবীও কিছুটা হেলানো ভাবে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। ফলে কক্ষপথের এক একটা জায়গায় পৃথিবীর এক একটা গোলার্ধ, সূর্যের দিকে বেশি ঝুঁকে থাকে।

কেন হেলানো?

পৃথিবী সৃষ্টির সময়ে বিভিন্ন মহাজাগতিক বস্তুর সঙ্গে সংঘর্ষের কারণেই পৃথিবীর অক্ষের এই হেলানো অবস্থান--- এমনটাই বিজ্ঞানীদের ধারণা।

বুঝে দেখো

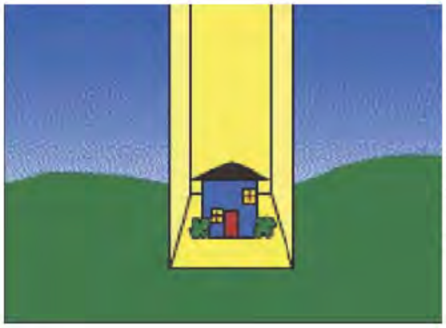

সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পড়লে, তা কম জায়গাকে অনেক বেশি উত্তপ্ত করে।

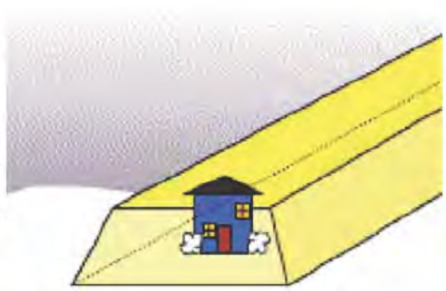

সূর্যরশ্মি তির্যকভাবে পড়লে বেশি জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু কম উত্তপ্ত করে।

ভেবে দেখেছো?

- এক বালতি জল দুপুর রোদে আধঘণ্টা রেখে দিলেই গরম হয়ে যায়!!
- **বলো তো, দিনের কোন সময়টা বেশি গরম লাগে?**

→ সকালে সূর্য ওঠার সময়? ☐

→ দুপুরে সূর্য যখন মাথার ওপর থাকে ? ☐

→ সন্ধ্যায়- সূর্যাস্তের সময়? ☐

→ রাতে- সূর্যাস্তের পর? ☐

পরীক্ষা করে দেখো

একটা অন্ধকার ঘরে টেবিলের ওপর বা সমতল মেঝের ওপর টর্চের আলো ফেলে দেখতে হবে।
প্রথমে টর্চটা টেবিলের ১-২ ফুট ওপরে লম্বভাবে ধরে লক্ষ করো—
টেবিলের ওপর যে আলোর বৃত্তটা তৈরি হয়েছে, সেটা কতটা জায়গা জুড়ে আছে?
আর দেখো আলোটা কতটা উজ্জ্বল?
এবার টর্চটাকে একই উচ্চতায় রেখে একটু হেলিয়ে ধরো।
দেখতো এবার আলোর জায়গাটা বাড়ল কিনা?
আর আলোটা আগের থেকে বেশি জোরালো না হালকা হলো?

ঋতুগুলো কেন আসে?

যখন উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে বেশি ঝুঁকে থাকে, তখন উত্তর গোলার্ধে ক্রমশ **দিনগুলো বড়ো আর রাত ছোটো হতে থাকে**। অর্থাৎ দিনের আলো অনেকক্ষণ পাওয়া যায়। সারাদিন ধরে সূর্যের তাপে পৃথিবী উত্তপ্ত হয়। অথচ রাত ছোটো হওয়ায় তেমন ঠান্ডা হওয়ার সময় পায় না। দিনের পর দিন এরকম হলে গরম বাড়তে থাকে। এই সময়ে **উত্তর গোলার্ধে সূর্যরশ্মি পড়ে অনেক লম্বভাবে**। তাই সূর্যের তাপও হয় প্রবল। এসময় উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল, আর দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল।

উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল, দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল

আবার যখন দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্যের দিকে বেশি ঝুঁকে থাকে , **উত্তর গোলার্ধে** তখন ক্রমশ **দিন ছোটো আর রাত বড়ো হতে থাকে**। দিনের আলো বেশিক্ষণ থাকে না বলে পৃথিবী বেশিক্ষণ ধরে উত্তপ্ত হয় না, রাতে ঠান্ডা হওয়ার সময় বেশি পায়। এইসময় **উত্তর গোলার্ধে সূর্যরশ্মি বাঁকাভাবে পড়ে**, তাই কম উত্তপ্ত হয়। এসময় উত্তর গোলার্ধে শীতকাল আর দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল।

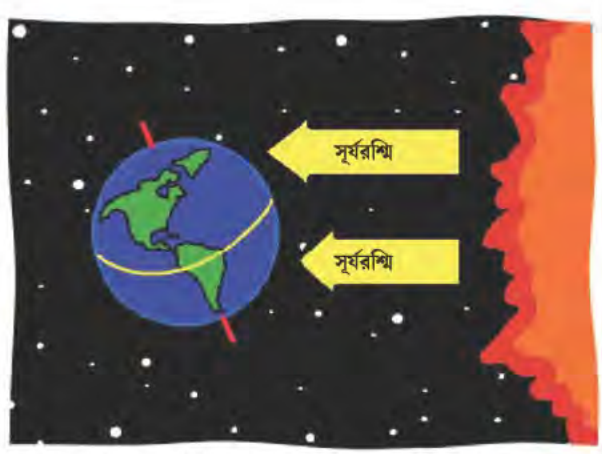

উত্তর গোলার্ধে শীতকাল, দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল

সূর্যের বার্ষিক আপাতগতি
রবিমার্গ

সারাবছর সূর্যটা কি আকাশের ঠিক একই জায়গায় ওঠে? হয়তো অনেকেই লক্ষ করেছ শীতকালে সূর্যটা পুব আকাশে একটু দক্ষিণ দিক ঘেঁষে আবার গ্রীষ্মকালে একটু উত্তর দিক ঘেঁষে ওঠে।

কীভাবে করবে?

এবার কাজে লাগতে হবে!

ভালো করে লক্ষ করবে আর চিহ্ন দিয়ে রাখবে। প্রতি মাসের ১ বা ২ তারিখে সকালে দেখবে সূর্যটা কোথায় উঠছে। সেদিক বরাবর একটা লম্বা দাগ দিয়ে রাখবে।

• নির্দিষ্ট মাস	• সূর্য কোনদিক ঘেঁষে ওঠে
মার্চ	———
মে-জুন	———
সেপ্টেম্বর	———
নভেম্বর-ডিসেম্বর	———

এরকম কেন হয়?

সূর্যের 'আপাতগতি' অর্থাৎ আপাতভাবে যা মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে না।

ঠিক যেমন চলন্ত বাস-ট্রেন থেকে মনে হয় গাছপালা ঘরবাড়ি সব পিছন দিকে সরে যাচ্ছে। অথবা নাগরদোলা চড়লে মনে হয় সবকিছু ঘুরছে।

তেমনি পৃথিবী পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করে বলে আপাতদৃষ্টিতে সূর্যকে প্রতিদিন পুব আকাশ থেকে পশ্চিম আকাশে চলাচল করছে বলে মনে হয়। এটা সূর্যের **দৈনিক আপাত গতি**।

হেলানো অক্ষের জন্য পৃথিবী কক্ষপথে এমনভাবে কাত হয়ে ঘোরে যে বছরের বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিষুবরেখা, কর্কটক্রান্তিরেখা ($২৩\frac{১}{২}^{\circ}$ উত্তর অক্ষরেখা) এবং মকরক্রান্তিরেখায় ($২৩\frac{১}{২}^{\circ}$ দক্ষিণ অক্ষরেখা) সূর্যের লম্বরশ্মি পড়ে। ফলে আপাতভাবে মনে হয় যে সূর্য পৃথিবীর বিষুবরেখা থেকে উত্তরে কর্কটক্রান্তি রেখা পর্যন্ত এবং দক্ষিণে মকরক্রান্তি রেখা পর্যন্ত চলাচল করে। এটাই সূর্যের **বার্ষিক আপাতগতি বা রবিমার্গ** (রবি = সূর্য, মার্গ = পথ)।

লক্ষ করেছ?

গরমকালে স্কুল থেকে ফিরে কতক্ষণ খেলা যায়। আর শীতকালে বিকেল হতে না হতেই সন্ধ্যা হয়ে যায়—

একটা খাতায় লিখে রাখতে পারলে ঠিক বোঝা যাবে— গরমকালে আর শীতকালে কতক্ষণ সূর্যের আলো থাকে।

একটা তালিকা বানিয়ে জুনমাসের প্রত্যেক সপ্তাহের একদিন করে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের সময়টা লিখে ফেলতে হবে। আবার ডিসেম্বর মাসেও প্রত্যেক সপ্তাহের একদিন করে লিখে ফেলতে পারলেই নিজেই বুঝতে পারবে গরমকালে আর শীতকালে কতটা ছোটো-বড়ো হয় দিন-রাত।

	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত	কত ঘণ্টা দিন
মার্চ/			
জুন	—	—	—
সেপ্টেম্বর	—	—	—
ডিসেম্বর	—	—	—

সূর্যের বার্ষিক আপাত গতি

বছরে দুটো দিন (২১ মার্চ এবং ২৩ সেপ্টেম্বর) বিষুবরেখায় সূর্যের লম্বরশ্মি পড়ে। আরও দুটো দিন ২১ জুন কর্কটক্রান্তিরেখায় এবং ২২ ডিসেম্বর মকরক্রান্তিরেখায় সূর্যের লম্বরশ্মি পড়ে। ২২ ডিসেম্বর থেকে ২১ জুন পর্যন্ত ৬ মাস ধরে সূর্যের উত্তরমুখী আপাতগতি হলো **উত্তরায়ণ**। একইভাবে ২১ জুন থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬ মাস ধরে সূর্যের দক্ষিণমুখী আপাতগতি হলো **দক্ষিণায়ন**।

বলো তো

- সূর্যের বার্ষিক আপাতগতি
- দিন-রাতের ছোটো বড়ো হওয়া
- ঋতু পরিবর্তন

কী কারণে হয়?

উত্তর :

১. পৃথিবীর উপবৃত্তাকার কক্ষপথ
২. পৃথিবীর অক্ষ হেলানো
৩. আবর্তন ও পরিক্রমণ গতি

প্রশ্ন : কোনটা ঠিক উত্তর?
(১, ২/২, ৩/১, ৩/১, ২, ৩)

গ্রীষ্ম ➲ শরৎ ➲ শীত ➲ বসন্ত

উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল

পৃথিবী তার কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে ২১ মার্চ তারিখে এমন একটা জায়গায় চলে আসে যে বিষুবরেখায় লম্বভাবে সূর্যরশ্মি পড়ে। এই দিন পৃথিবীর উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত সর্বত্রই **দিন-রাত্রি সমান** অর্থাৎ ১২ ঘণ্টা দিন এবং ১২ ঘণ্টা রাত হয়। সব জায়গায় স্থানীয় সময় অনুযায়ী সকাল ৬ টায় সূর্য ওঠে এবং সন্ধ্যা ৬ টায় অস্ত যায়। এই ঘটনাকে **'বিষুব'** (Equinox) বলা হয় ('বিষুব' কথার অর্থ 'সমান দিন ও রাত্রি')।

বিষুব

বাংলা ক্যালেন্ডার দেখেছো?

আমাদের দেশে ছটা ঋতু। কিন্তু নিরক্ষীয় অঞ্চল এবং মেরু অঞ্চল ছাড়া সারা পৃথিবীতে গ্রীষ্ম, শরৎ, শীত, বসন্ত এই চারটি ঋতুই প্রধান। আমাদের দেশে গ্রীষ্মের পরে বর্ষা আর শরতের পর কিছুদিনের জন্য হেমন্তকাল আসে। গ্রীষ্ম, বর্ষা আর শীত এই তিনটে ঋতু আমাদের দেশে অন্য ঋতুগুলোর থেকে অনেক বেশি দিন থাকে।

দিন এবং রাত প্রায় সমান হওয়ায় এই সময়ে (মার্চ-এপ্রিল মাস) আবহাওয়াটাও থাকে গরম ঠান্ডার মাঝামাঝি। উত্তর গোলার্ধে এই সময় বসন্তকাল। তাই ২১ মার্চের 'বিষুব' কে উত্তর গোলার্ধে **বসন্তকালীন বিষুব** বলা হয়।

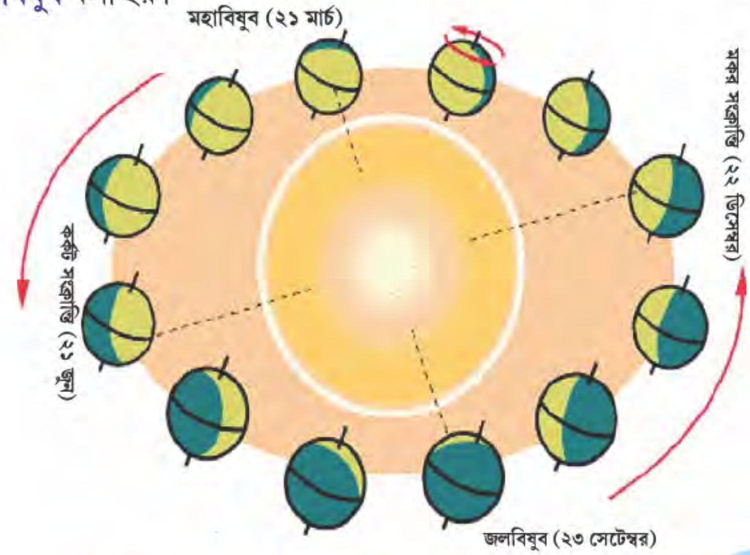

সূর্যঘড়ির ছায়া!

তোমার সূর্যঘড়িটায় ২১ মার্চ, ২১ জুন, আর ২২ ডিসেম্বরের দুপুর ১২ টায় সময় ছায়ার দৈর্ঘ্য মেপে দেখো।

কোনদিন সবথেকে ছোটো ছায়া পড়লো?---------

কোনদিন সবথেকে বড়ো ছায়া পড়লো?----------

উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল

২১ মার্চের বিষুবের পর থেকে পৃথিবী ধীরে ধীরে এমন একটা জায়গায় আসতে থাকে, যখন সূর্য রশ্মি ক্রমশ উত্তর গোলার্ধে লম্বভাবে পড়তে থাকে। এর ফলে উত্তর গোলার্ধে ক্রমশ দিন বড়ো (১২ ঘণ্টার বেশি) আর রাত ছোটো (১২ ঘণ্টার কম) হতে থাকে। সূর্যের উত্তরায়নের এই সময়টা উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল।

'সংক্রান্তি' (Solstice) তখন এবং এখন

বছরের সবথেকে বড়ো আর সবথেকে ছোটো দিনদুটো প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন কারণে (বছরগণনা, শস্যরোপণ) গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এখনও ভারত আয়ারল্যান্ড, চিন, দক্ষিণ আমেরিকায় সংক্রান্তি উপলক্ষে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রচলিত।

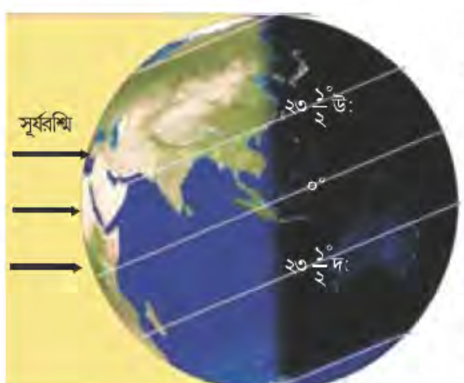

কর্কটসংক্রান্তি

২১ জুন পৃথিবী নিজ কক্ষপথে এমন একটা জায়গায় আসে যে উত্তর গোলার্ধে কর্কটক্রান্তি রেখার ($২৩\frac{১}{২}^{\circ}$ উত্তর অক্ষরেখা) ওপর লম্বভাবে সূর্যরশ্মি পড়ে। এই দিন **উত্তর গোলার্ধে দিন সবথেকে বড়ো আর দক্ষিণ গোলার্ধে সবথেকে ছোটো হয়**। সুমেরুবৃত্তে ২৪ ঘণ্টাই সূর্যকে দেখা যায়। আর কুমেরুবৃত্তে ২৪ ঘণ্টাই অন্ধকার থাকে। ২১ জুনকে **'কর্কটসংক্রান্তি' (Summer Solstice)** বলা হয়।

উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল

২১ জুনের পর সূর্যের দক্ষিণায়ন শুরু হয়। সূর্যের লম্বরশ্মি ক্রমশ বিষুবরেখার দিকে সরতে থাকে । ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে কক্ষপথে পৃথিবী এমন একটা অবস্থানে আসে যে বিষুবরেখায় সূর্যের লম্বরশ্মি পড়ে। ফলে উত্তরমেরু থেকে দক্ষিণমেরু পর্যন্ত সর্বত্র দিন-রাত সমান হয়। ২১ মার্চ এর মতো এই দিনটাও বিষুব। এই সময়ে (সেপ্টেম্বর -অক্টোবর মাস) আবহাওয়া ঠান্ডা গরমের মাঝামাঝি থাকে। উত্তর গোলার্ধে এই সময় শরৎকাল। একারণে ২৩ সেপ্টেম্বরের বিষুবকে **শরৎকালীন বিষুব** বলে।

উত্তর গোলার্ধে শীতকাল

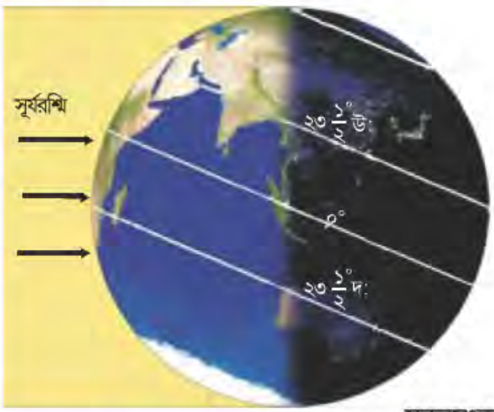

মকরসংক্রান্তি

২৩ সেপ্টেম্বরের পর থেকে পৃথিবী ধীরে ধীরে এমন একটা অবস্থানে আসে যখন সূর্যের লম্বরশ্মি ক্রমশ দক্ষিণ গোলার্ধে পড়তে থাকে। ফলে দক্ষিণ গোলার্ধে দিন বড়ো আর রাত ছোটো হতে থাকে। সূর্যের দক্ষিণায়নের এই সময়টা উত্তর গোলার্ধে শীতকাল আর দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল।

২২ ডিসেম্বর পৃথিবী কক্ষপথের এমন অবস্থানে আসে যে দক্ষিণ গোলার্ধে মকরক্রান্তি রেখার (২৩ $\frac{১}{২}$° দক্ষিণ অক্ষরেখা) ওপরে সূর্যের লম্বরশ্মি পড়ে। এই দিন দক্ষিণ গোলার্ধে দিন সবথেকে বড়ো আর উত্তর গোলার্ধে দিন সবথেকে ছোটো হয়। কুমেরুবৃত্তে ২৪ ঘণ্টাই সূর্যকে দেখা যায় আর সুমেরুবৃত্তে ২৪ ঘণ্টাই অন্ধকার থাকে। ২২ ডিসেম্বরকে **মকরসংক্রান্তি (Winter Solstice)** বলা হয়।

কত গরম মাপো

জ্বর হলে, গা গরম হলে থার্মোমিটার দিয়ে মাপা হয়। তেমনি শীতকালে কতটা ঠান্ডা এবং গরমকালে কতটা গরম তাও মাপতে পারবে। একটা কাঁচের বা প্লাস্টিকের ছিপিসহ বোতল আর একটা নল দিয়েই চলনসই একরকম থার্মোমিটার বানিয়ে ফেলতে পারো। ছিপিটার মধ্যে একটা সরু কাচের নল লাগাতে হবে এমনভাবে যাতে জল গলতে না পারে। বোতলে কিছুটা রঙিন জল ঢালো, যাতে সরু নলে একটু জল ওঠে। বোতলটা রোদে রেখে দিলে গরমে জলটা বাড়বে। তখন নলে আরো জল উঠবে। এইভাবে, শীতের দুপুরে-রাতে, গরমের দুপুরে-রাতে বিভিন্ন সময়ে দেখবে নলে কখন কতটা জল উঠলো। এর থেকেই ধারণা হয়ে যাবে কতটা গরম হলে জলটা কতটুকু উঠতে পারে।

'বড়োদিন' কি আসলে বড়ো দিন?

খেয়াল করেছো 'বড়োদিন' বা যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন (২৫ ডিসেম্বর), ২২ ডিসেম্বর মকরসংক্রান্তির কয়েকদিন পরেই। আসলে ঐ সময় থেকে উত্তর গোলার্ধে আবার দিন বড়ো হতে শুরু করে। তাহলে উত্তরগোলার্ধে 'বড়োদিন' কি আসলে 'বড়ো' দিন?

'আলোকিত' রাত্রি
'অন্ধকার' দিন

ছোটোবেলা থেকে আমরা দেখে আসছি দিনের পর রাত আর রাতের পরে দিন বাঁধা নিয়মে আসে আর যায়। কিন্তু দিনের আলো আর রাতের অন্ধকারের পালাবদলের ব্যাপারটা পৃথিবীর সব জায়গায় আমাদের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে মেলে না।

অন্ধকার দিন

পৃথিবীর দুই মেরুবৃত্তে (৬৬$\frac{১}{২}^{\circ}$ উত্তর এবং ৬৬$\frac{১}{২}^{\circ}$ দক্ষিণ অক্ষরেখা থেকে সুমেরু এবং কুমেরু) সারাবছরই সূর্যের আলো বাঁকাভাবে পড়ে। মার্চ থেকে জুলাই-এই সময়টায় উত্তর গোলার্ধে সুমেরু-বৃত্তীয় অঞ্চলে সূর্য কখনই দিগন্তের নীচ থেকে ওঠে না বা অস্ত যায় না। সূর্য প্রায় দিগন্তের সমান্তরালে আকাশের পূর্বদিক থেকে পশ্চিমদিকে চলাচল করে। এসময় ২৪ ঘণ্টাই একটানা দিনের আলো থাকে। অর্থাৎ স্থানীয় সময় অনুসারে তখন রাত হওয়া সত্ত্বেও সূর্যকে আকাশে দেখা যায়। আবার সেপ্টেম্বর থেকে জানুয়ারি এর সময়টাও একইভাবে দক্ষিণ গোলার্ধে কুমেরুবৃত্তীয় অঞ্চলে এইরকম 'আলোকিত রাত্রি' সহ 'একটানা দিন' হয়।

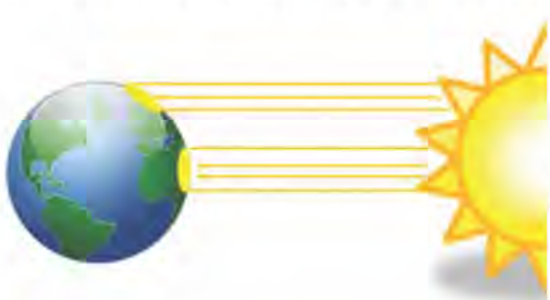

মধ্যরাত্রির সূর্য

মার্চ থেকে জুন বা জুলাই-এই সময়ে কানাডা, ডেনমার্ক, আলাস্কা, নরওয়ে,সুইডেন, আইসল্যান্ড-এর অনেক জায়গা থেকে স্থানীয় সময় অনুযায়ী গভীর রাত্রিতে কিছু সময়ের জন্য দিগন্তরেখায় সূর্যকে দেখা যায়। নরওয়ের উত্তরে হ্যামারফেস্ট বন্দরে মে মাস থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত সূর্যকে রাতের বেলায় স্পষ্টভাবে দেখা যায় বলে, একে **মধ্যরাত্রির সূর্যের দেশ** বলা হয়।

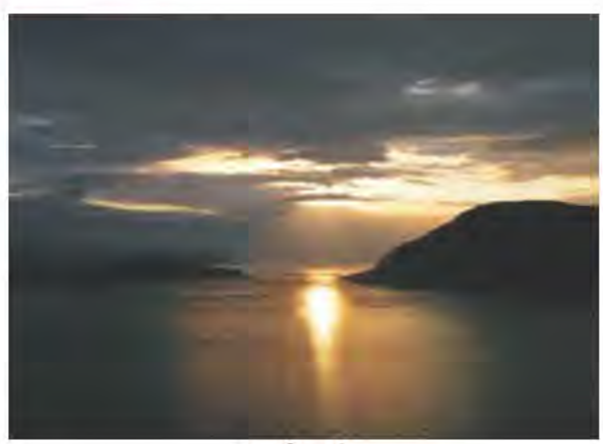
মধ্য রাত্রির সূর্য

সেপ্টেম্বর থেকে জানুয়ারী-এই সময়ে কয়েক মাস সুমেরুবৃত্তীয় অঞ্চলে সূর্য একেবারেই ওঠে না। তখন দিনের পর দিন ২৪ ঘণ্টাই অন্ধকার থাকে। অর্থাৎ স্থানীয় সময় অনুযায়ী 'দিন' হওয়া সত্ত্বেও আকাশে সূর্যকে দেখা যায় না। আবার মার্চ থেকে জুন এই সময়ে কুমেরুবৃত্তীয় অঞ্চলেও এরকম 'অন্ধকার দিন' সহ একটানা রাত হয়।

মেরুবৃত্তে সূর্যের কাল্পনিক দৈনিক চলাচল

সুমেরু এবং কুমেরুতে আবার একটানা ছমাস দিন এবং ছ মাস রাত হয়। সূর্যের উত্তরায়নের সময় সুমেরুতে টানা ছমাস দিন হয়। ঐ সময় কুমেরুতে ছমাস রাত হয়। দক্ষিণায়নের সময় কুমেরুতে টানা ছমাস দিন এবং ঐ সময় সুমেরুতে ছমাস রাত হয়। দুই মেরু অঞ্চলে একটানা রাত এর সময় তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে থাকে। আবার দিন এর সময়টাও তাপমাত্রা খুবই কম থাকে।

সুমেরু প্রভা (Aurora Borialis), কুমেরু প্রভা (Aurora Australis)

দুই মেরু প্রদেশ একটানা রাত চলার সময় মাঝে মাঝে আকাশে রাংধনুর মতো রঙিন আলোর জ্যোতি (অরোরা) দেখা যায়। বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন আয়নিত গ্যাসের সঙ্গে সূর্যরশ্মির সংঘর্ষের ফলে মেরু অঞ্চলের আকাশে এরকম বিচ্ছুরিত আলোর সৃষ্টি হয়।

!! মগজাস্ত্র !!

● **ভেবে দেখো, ঠিক পারবে।**

● পৃথিবীর অক্ষটা যদি পৃথিবীর কক্ষের ওপর লম্ব হতো? (বৃহস্পতির অক্ষটা এরকমই কক্ষের ওপর লম্ব)

● পৃথিবীর অক্ষ যদি কক্ষপথের সমতলে থাকতো? (ইউরেনাস এর অক্ষটা এরকমই)

— এই দুটো ক্ষেত্রে দিন-রাত এবং ঋতুপরিবর্তন কেমন হতো বলো তো?

● পৃথিবীর কোথায় সারাবছরই দিন রাত সমান থাকে?

● ২১ মার্চ তারিখে স্থানীয় সময় অনুযায়ী কটার সময় টোকিয়ো, কলকাতা, সিডনিতে সূর্য উঠবে?

● ৪ জুলাই , ২৫ জানুয়ারি, ২০ সেপ্টেম্বর বিষুবরেখার যে কোনো জায়গায় কটার সময় সূর্য উঠবে? জুন মাসে বরফপড়া বা ডিসেম্বর মাসে গরমের হলকা কোথায় কোথায় হতে পারে?

● ২৩ সেপ্টেম্বর স্থানীয় সময়ে কটার সময় নিউ ইয়র্ক, দিল্লি, কায়রোতে সূর্য ডুববে?

বিভিন্ন রকম অরোরা

ঋতুবৈচিত্র্য ও আমরা

রিয়া আর পিন্টু মিলে এই ছবিটা এঁকেছে। তুমিও তোমার মতো এঁকে ফেলে ঋতুগুলো ও তার ফল, ফুল, সবজি, গাছপালা, বিভিন্ন উৎসব, খাবার দাবার।

ঋতুবৈচিত্র্য প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেমন—সময় গণনা, ক্যালেন্ডার তৈরি, কৃষিকাজ,অন্যান্য জীবিকা,বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব সবই ঋতুনির্ভর। উদ্ভিদ-প্রাণীর সঠিক বৃদ্ধি, বিকাশ এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্যের জন্যও ঋতু পরিবর্তন প্রয়োজনীয়। সারাবছর ধরে ঋতুগুলোর যাওয়া আসার ফলে আমাদের জীবনে বৈচিত্র্য,উৎসাহ আসে, যা আমাদের সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করে।

ভেবে দেখেছো, উত্তর আর দক্ষিণ গোলার্ধে ঋতুগুলো উল্টো ??

বিশেষ দিন	উত্তর গোলার্ধ		ঋতু অনুযায়ী ফলমূল, সবজি, উৎসবের নাম	দক্ষিণ গোলার্ধ	
২১ মার্চ	দিন-রাত্রি সমান হয়	বসন্তকাল	পলাশ, জলপাই, হোলি	দিন-রাত্রি সমান	শরৎকাল
২১ জুন	সবচেয়ে বড়ো দিন	গ্রীষ্মকাল	________ ________	সবচেয়ে ছোটো ________	________
২৩ সেপ্টেম্বর	________ ________	শরৎকাল	শিউলি, কাশ আতা, দুর্গাপুজো	________ ________	বসন্তকাল
২২ ডিসেম্বর	সবচেয়ে ছোটো ________	শীতকাল	________ ________	সবচেয়ে বড়ো দিন	________

মজার খেলা-শব্দ সন্ধান

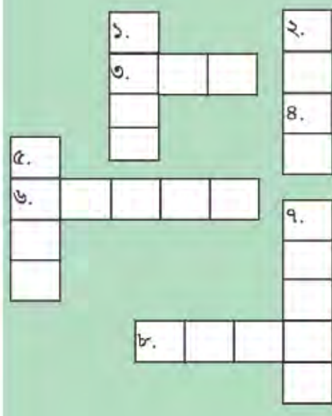

উপরনীচ

১. সূর্যের আপাত বার্ষিক গতি

২. পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব সব থেকে কম হয় যে অবস্থানে।

৫. পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব সব থেকে বেশি হয় যে অবস্থানে।

৭. এই শক্তির জন্য পৃথিবী সমস্ত কিছুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে।

পাশাপাশি

২. মেরু প্রভার অপর নাম।

৩. সমান দিন ও রাত্রি।

৬. বার্ষিক গতির অপর নাম।

৪. উত্তর মেরুকে যা বলে।

৮. যে বছরে ৩৬৬টা দিন থাকে।

হাতে কলমে

- কোন কোন ঋতুতে বেশিরভাগ দিন নীল আকাশ দেখা যায়?
- কোন ঋতুতে মাঠের মাটি ফেটে যায়?
- কোন ঋতুতে পুকুরগুলো জলে ভর্তি থাকে?
- কোন কোন ঋতুতে বন্যার সম্ভাবনা থাকে?
- কোন কোন ঋতুতে ডোবা,খাল বিল ছেঁচে মাছ ধরা হয়?
- কোন ঋতুতে সূর্য পূর্ব আকাশের সবথেকে দক্ষিণ ঘেঁষে ওঠে?
- কোন ঋতুতে দুপুর ১২টায় ছায়ার দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি হয়?
- কোন ঋতুতে খুব কোকিল ডাকে?
- উত্তর গোলার্ধে কোন ঋতুতে সবথেকে বড়ো দিন হয়?
- ২৫ ডিসেম্বর ‘বড়োদিন’ এ দক্ষিণ গোলার্ধে গরম না ঠান্ডা?
- বিজ্ঞানীরা আন্টার্কটিকা মহাদেশ অভিযানে ডিসেম্বর মাসে কেন যান?
- জুলাই না জানুয়ারি কোন মাসে আমরা সূর্যের বেশি কাছে আসি?

ভূ-পৃষ্ঠে কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয়

সাদা মার্বেলের ওপর কোনো বিন্দু যার সঠিক অবস্থান আমাদের জানা নেই।

পৃথিবী যে গোলাকার তা আমরা সকলেই জানি। তোমাদের খেলার বল, মার্বেল বা গ্লোবকে পৃথিবীর ক্ষুদ্র রূপ বলে ধরা যেতে পারে। ওইরকম কোনো জিনিসের ওপর কোনো একটা বিন্দু নাও। **কিন্তু বিন্দুটা বল বা মার্বেলটার ঠিক কোথায় অবস্থিত তা তুমি বলতে পারো কি?** পাড়ার যেকোনো বাড়ি ঠিক কোথায় কেউ জিজ্ঞেস করলে সহজেই বলে দেওয়া যায়। কিন্তু **সেই জায়গাটাই, পৃথিবীর ওপর ঠিক কোথায় তুমি কীভাবে বোঝাবে?**

সাদা মার্বেলটার ওপরে যে বিন্দুটা দেখানো হয়েছে, তার অবস্থান কোথায়? — কেউ বলবে মার্বেলটার পূর্ব দিকে, কেউবা বলবে মার্বেলটার উত্তর দিকে। কিন্তু মার্বেলটা ঘুরিয়ে বিন্দুর জায়গাটা নীচের দিকে বা অন্য কোনো দিকে করে দিলেই বিন্দুর অবস্থান পাল্টে যাবে।

তাহলে পৃথিবী-পৃষ্ঠে কোনো স্থানের সঠিক অবস্থান কী ভাবে নির্ণয় করবে?

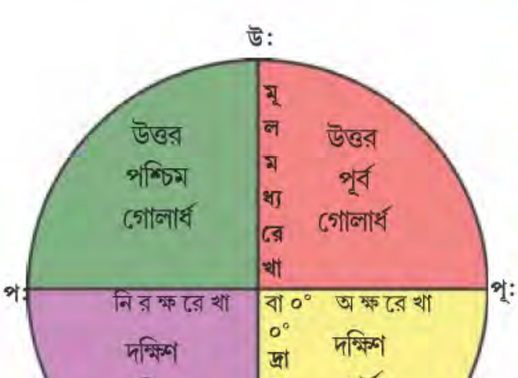

নিরক্ষরেখা ও মূলমধ্যরেখার দ্বারা গোলার্ধভাগ।

আমরা যা জানি

পৃথিবী পৃষ্ঠের ওপর দুটি গুরুত্বপূর্ণ কল্পিত রেখা হলো—

- নিরক্ষরেখা বা বিষুবরেখা বা ০০ অক্ষরেখা।
- মূলমধ্যরেখা বা ০০ দ্রাঘিমারেখা।

নিরক্ষরেখা পৃথিবীর ঠিক মাঝখান দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। নিরক্ষরেখা পৃথিবীকে সমান দুটি অংশে ভাগ করে, উত্তরের অংশ উত্তর গোলার্ধ ও দক্ষিণের অংশ দক্ষিণ গোলার্ধ। মূলমধ্যরেখাকে গ্রেটার লন্ডনের রয়াল গ্রিনিচ নামক স্থানের ওপর দিয়ে কল্পনা করা হয়েছে। মূলমধ্যরেখাও পৃথিবীকে দুটি সমান ভাগে ভাগ করে। পূর্বের অংশ পূর্ব গোলার্ধ এবং পশ্চিমের অংশ পশ্চিম গোলার্ধ ।

এবার একটা মজার খেলা...

- মানচিত্র বই নিয়ে দলে ভাগ হয়ে নাও।
- পৃথিবীর মানচিত্র থেকে বিভিন্ন শহরের নামের তালিকা তৈরি করো। প্রতিটা মহাদেশ থেকেই শহরগুলো নেওয়ার চেষ্টা করো।
- এবার লক্ষ করতে হবে সেগুলো কোন গোলার্ধের অন্তর্গত।
- সেইমতো তালিকায় (✓) চিহ্ন দাও।
- তারপর গোলার্ধ ভাগ করা অংশে সাংকেতিক চিহ্ন বসাও। যেমন কলকাতার জন্য 'ক'।
- নমুনা লক্ষ করো।

শহরের নাম	কলকাতা					
উত্তর-পূর্ব অংশ	✓					
দক্ষিণ-পূর্ব অংশ						
উত্তর-পশ্চিম অংশ						
দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ						

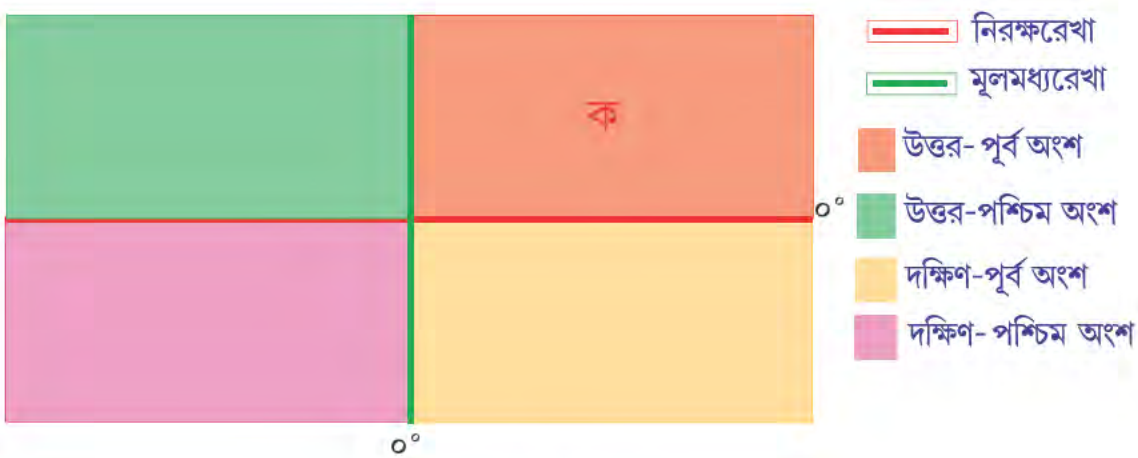

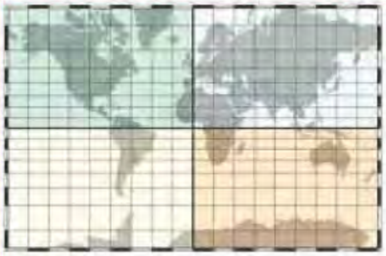

একটা গ্লোব বা মানচিত্র খেয়াল করলে দেখা যায় পৃথিবীর ওপর কতকগুলো আড়াআড়ি ও লম্বালম্বি দাগ কাটা আছে। **কালো দাগগুলো কী?**

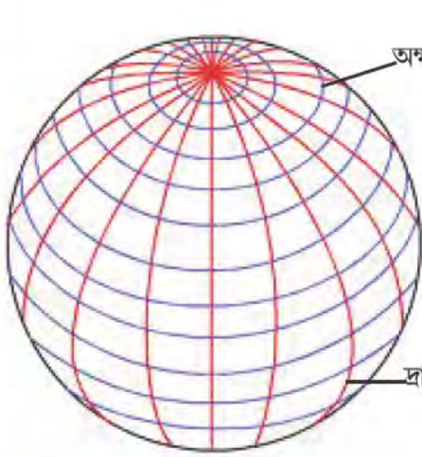

নিরক্ষরেখার সমান্তরালে পূর্ব-পশ্চিমে কল্পিত রেখাগুলো হলো **অক্ষরেখা** (Parallels of Latitude)।

পৃথিবীর উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে কল্পিত রেখাগুলো হলো **দ্রাঘিমারেখা** (Meridians of Longitude)।

উভয় রেখা পৃথিবীর ওপর জালের (Grid) মতো বিস্তার করে আছে।

আমরা জানি গ্লোব হল পৃথিবীর ছোটো প্রতিরূপ।

অক্ষরেখা

নিরক্ষরেখা, ভূ-পৃষ্ঠের কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। নিরক্ষরেখার সমান্তরালে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত কল্পিত পূর্ণবৃত্তগুলো হলো অক্ষরেখা। অক্ষরেখার বৃত্তগুলো মেরুরদিকে ক্রমশ ছোটো হতে থাকে। অক্ষরেখা ডিগ্রি (°) তে পরিমাপ করা হয়।

একটা বলের ওপর অক্ষরেখা, নিরক্ষরেখা, উত্তর-দক্ষিণ মেরুবিন্দু এঁকে তৈরি করো তোমার ছোটো পৃথিবী।

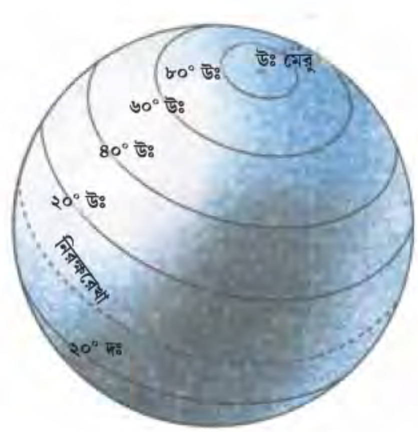

ভূ-পৃষ্ঠে অঙ্কিত অক্ষরেখা

নিরক্ষরেখার মান ০°। নিরক্ষরেখার উত্তরের অক্ষরেখাগুলো হলো '**উত্তর অক্ষরেখা**'। নিরক্ষরেখার দক্ষিণের অক্ষরেখাগুলো হলো '**দক্ষিণ অক্ষরেখা**'। অক্ষরেখাগুলো ১° অন্তর কল্পনা করা হয়েছে। প্রতি ডিগ্রি অক্ষরেখাকে ৬০'-এ ও প্রতি মিনিট অক্ষরেখাকে ৬০''-এ ভাগ করা হয়েছে।

'উঃ' ও 'দঃ' অক্ষরেখা

অক্ষরেখা উত্তর গোলার্ধের হলে 'উঃ' ও দক্ষিণ গোলার্ধ হলে 'দঃ' ব্যবহার করা হয়। দুটি মেরু বিন্দুর মান ৯০° উঃ ও ৯০° দঃ।। কোনো স্থান নিরক্ষরেখা থেকে কতটা উত্তরে বা কতটা দক্ষিণে তা বোঝাতেই অক্ষরেখার প্রয়োজন হয়। যেমন, কলকাতা অবস্থান করছে ২০°৩৪' উঃ অক্ষরেখার ওপর। তাহলে আমরা বলতেই পারি পৃথিবীতে কলকাতার অবস্থান ২০°৩৪' উঃ।

অক্ষাংশ

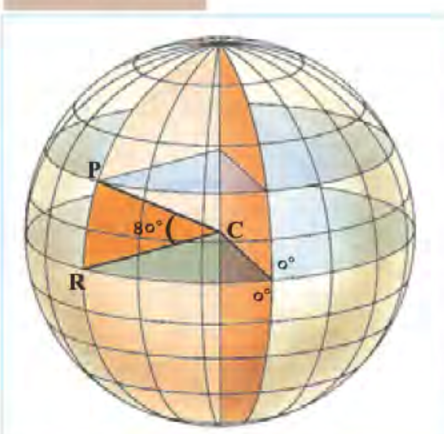

একটা কাঁচ বা প্লাস্টিকের স্বচ্ছ বলকে পৃথিবী বলে ধরে নাও। C ওই বলটার তথা পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু। পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু C থেকে নিরক্ষরেখা পর্যন্ত টানা সরলরেখা হলো CR। P হলো এমন যে কোনো বিন্দু যা বলটার ওপর মানে পৃথিবীর ওপর আছে। PC হল, P বিন্দু থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত টানা সরলরেখা। PC ও CR, C বিন্দুতে ৪০° কোণ (∠) তৈরি করেছে। সুতরাং P বিন্দুর অক্ষাংশ হলো ৪০° উঃ। P স্থানটি নিরক্ষরেখার উত্তরে অবস্থিত। এভাবে পৃথিবী-পৃষ্ঠের যে কোনো জায়গা পৃথিবীর কেন্দ্রে, নিরক্ষরেখা থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত টানা সরলরেখার সঙ্গে যে কোণ (∠) তৈরি করে, তাই হলো ওই স্থানের **অক্ষাংশ**। একই অক্ষাংশ যুক্ত স্থান পৃথিবীর কেন্দ্রে একই কোণ তৈরি করে। সোজা কথায় একই অক্ষাংশ যুক্ত স্থানগুলোকে যদি একটা কাল্পনিক রেখা দিয়ে জুড়ে দেওয়া যায় তবে সেই রেখাটাই হবে অক্ষরেখা। এক্ষেত্রে ওই অক্ষরেখার মান হবে ৪০° উঃ।

বাড়িতে যদি ছুরি দিয়ে তরমুজকে ছবির মতো করে কেটে দেখো, তাহলে অক্ষাংশের ধারণাটা ভালোভাবে বুঝতে পারবে।

তরমুজ কেটে অক্ষাংশ দেখা

আর একটা মজার খেলা.....

দলে ভাগ হয়ে পৃথিবীর মানচিত্র দেখে বিভিন্ন শহরের যে তালিকা তৈরি করেছিলে, সেই তালিকার শহরগুলি কত ডিগ্রি (°) অক্ষরেখায় আছে? মোটামুটিভাবে কাছাকাছি অক্ষরেখা দেখলেই হবে। নীচের ছকে সেগুলোকে বসাও:

শহরের নাম	কলকাতা									
কত ডিগ্রি অক্ষরেখা										

দ্রাঘিমারেখা

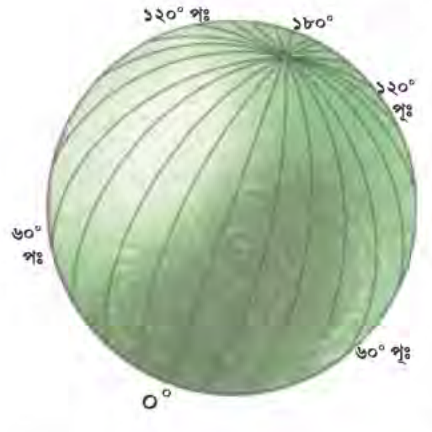

বিভিন্ন শহরের অক্ষাংশ বের করতে গিয়ে তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো, একাধিক জায়গায় একই অক্ষরেখায় একে অপরের পূর্ব-পশ্চিমে রয়েছে। কোনো স্থান পৃথিবীর পৃষ্ঠের কতটা উত্তরে বা কতটা দক্ষিণে তা অক্ষাংশের দ্বারা নির্ণয় করা যায়। কিন্তু পৃথিবীর ওপরে বিভিন্ন স্থান একে অপরের কতটা পূর্বে বা কতটা পশ্চিমে সেটা কীভাবে নির্ণয় করা যাবে? তাহলে, শুধু অক্ষরেখা নয়। পৃথিবী পৃষ্ঠে কোনো জায়গার সঠিক অবস্থান বোঝাতে আরও বেশি কিছু দরকার।

পৃথিবী-পৃষ্ঠে কোন স্থান কতটা পূর্বে বা কতটা পশ্চিমে তা ঠিক করতে

মূলমধ্যরেখার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। মূলমধ্যরেখার মান ০°। মূলমধ্যরেখা থেকে পূর্বে ও পশ্চিমে উত্তর মেরু বিন্দু থেকে দক্ষিণ মেরু বিন্দু পর্যন্ত অঙ্কিত লম্বালম্বি রেখাগুলো হলো দ্রাঘিমারেখা। দ্রাঘিমারেখা পরস্পর সমান্তরাল নয়। প্রত্যেকটি দ্রাঘিমারেখা উত্তর ও দক্ষিণমেরুতে গিয়ে মিশেছে।

মানচিত্র বই থেকে একই অক্ষরেখায় অবস্থিত এরকম বিভিন্ন জায়গার নামের তালিকা চটপট তৈরি করে ফেলো।

মূলমধ্যরেখার পূর্বের দ্রাঘিমারেখা হলো 'পূর্ব দ্রাঘিমা'। মূলমধ্যরেখার পশ্চিমের দ্রাঘিমারেখা হলো 'পশ্চিম দ্রাঘিমা'। দ্রাঘিমা রেখা পূর্ব গোলার্ধের হলে 'পূঃ' ও পশ্চিম গোলার্ধের হলে 'পঃ' ব্যবহার করা হয়। দ্রাঘিমারেখাও ডিগ্রি (°) তে পরিমাপ করা হয়। অক্ষরেখার মতো প্রতি ডিগ্রি দ্রাঘিমারেখাকে ৬০' (মিনিট) ও প্রতি মিনিটকে ৬০" (সেকেন্ডে) ভাগ করা হয়েছে। এই মিনিট বা সেকেন্ড কিন্তু কোনোটাই সময়ের মিনিট বা সেকেন্ড নয়।

পূঃ ও পঃ দ্রাঘিমারেখা

দ্রাঘিমাংশ

অক্ষাংশ বোঝবার সময় আমরা দেখেছি কীভাবে দুটি সরলরেখা পৃথিবীর কেন্দ্রে কোণ (∠) তৈরি করে। দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মূলমধ্যরেখাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রেখা হিসাবে ধরা হয়। ভূ-গোলকে মূলমধ্যরেখা (০° দ্রাঘিমারেখা) থেকে একটি সরলরেখা পৃথিবীর কেন্দ্র (C বিন্দু) পর্যন্ত টানা হয়েছে। P নামক স্থানটি যে দ্রাঘিমায় অবস্থিত সেখান থেকেও অপর একটা সরলরেখা কেন্দ্র পর্যন্ত টানা আছে। ওই দুই সরলরেখা পৃথিবীর কেন্দ্রে যে কোণ (∠ RCP) তৈরি করেছে সেটাই দ্রাঘিমাংশ। ধরা যাক তার মান ৬০°। অতএব স্থানটির দ্রাঘিমাংশ হবে ৬০° পঃ। সহজ করে বলতে গেলে একই দ্রাঘিমাংশ যুক্ত স্থানগুলোকে যদি একটা সরলরেখা দিয়ে জুড়ে দেওয়া যায় তবে সেই সরলরেখাটাই হবে দ্রাঘিমারেখা।

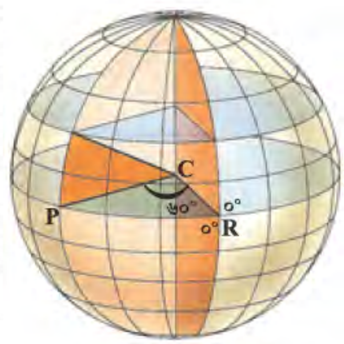

বাড়িতে আপেল বা সবেদা লম্বালম্বিভাবে একফালি কেটে নিলে দ্রাঘিমাংশের ধারণা পাওয়া যায়। ফালিটি সরিয়ে নেওয়ার পর একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়। ওই ফাঁকা জায়গার দু'পাশে দুটো দেয়াল দেখা যায়। ওই দেয়ালের একটিকে মূলমধ্যরেখার দেয়াল আর অন্যটিকে যে কোনো জায়গার দ্রাঘিমার দেয়াল ভেবে ফেলা যায়। ঐ দুটি দেয়ালের মাঝখানে যে কোণ (∠) তৈরি হয়েছে সেটাই দ্রাঘিমার মান।

ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনের গ্রিনিচ-এ আছে রয়াল **অ্যাস্ট্রনমিক্যাল অভজারভেটরি**। সেখানে একটি সংকর ধাতুর তৈরি দণ্ড রাখা আছে। সেটি ০° দ্রাঘিমারেখাকে (মূলমধ্যরেখা) চিহ্নিত করে। পর্যটকরা ঐ দণ্ডটার দুই দিকে দুই পা রেখে নিজের ছবি ক্যামেরা বন্দি করে। এক পা পূর্ব গোলার্ধে, আরেক পা পশ্চিম গোলার্ধে থাকে। কী মজার ব্যাপার না!

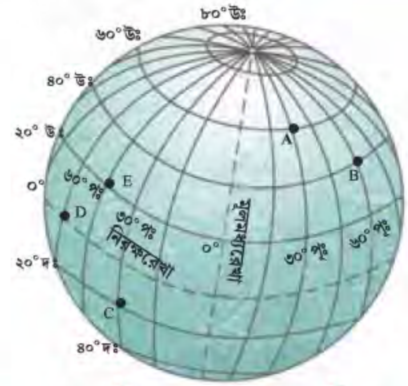

অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার পারস্পরিক ছেদ বিন্দু দিয়েই ভূপৃষ্ঠে কোনে স্থানের অবস্থান নির্ধারিত হয়।

খুব সহজে ভু-পৃষ্ঠে অবস্থান নির্ণয় করে ফেলো

স্থান	অক্ষাংশ	দ্রাঘিমাংশ
A		
B		
C		
D		
E		

অক্ষরেখার পরিচয়

- অক্ষরেখা পরস্পর সমান্তরাল।
- অক্ষরেখাগুলো পূর্ণবৃত্ত।
- অক্ষরেখার পরিধি ক্রমশ মেরুর দিকে কমে যায়।
- অক্ষরেখার মান মেরুর দিকে বেড়ে যায়।
- অক্ষরেখার মধ্যে নিরক্ষরেখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নিরক্ষরেখার মান ০°।
- নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর মেরু (৯০° উঃ) পর্যন্ত ৮৯ টা এবং দক্ষিণ মেরু (৯০° দঃ) পর্যন্ত ৮৯ টা মোট ১৭৮ টা অক্ষরেখা কল্পনা করা হয়েছে।
- ৯০° উ: এবং ৯০° দঃ হল যথাক্রমে উঃ মেরু বিন্দু এবং দঃ মেরুবিন্দু।

ভেবে দেখো

নিরক্ষরেখা থেকে মেরুর দিকে গেলে, কী কী পরিবর্তন লক্ষ করবে?

সূত্র: সূর্যরশ্মি মেরুর দিকে ক্রমশ তির্যক ভাবে পড়ে।

মগজাস্ত্র.....

- ❒ একই অক্ষরেখা বরাবর স্থানগুলোতে একই সময়ে দিন ও রাত হয় কি? যদি না হয় তাহলে কেন হয় না?
- ❒ বিভিন্ন অক্ষরেখায় তাপের কীরকম পার্থক্য অনুভূত হবে?
- ❒ দুটো অক্ষরেখার মাঝখানে কোনো স্থানের অবস্থান কীভাবে নির্ণয় করা হবে?
- ❒ কোথায় গেলে পূর্ব আর পশ্চিম গোলার্ধ উভয়ই একই সঙ্গে দেখতে পাবে?

ভেবে দেখো তো!

নিরক্ষরেখা বরাবর পূর্ব-পশ্চিমে গেলে কী অভিজ্ঞতা হবে?

(১) মূলমধ্যরেখা থেকে পূর্বে গেলে সে 'সময়' এগিয়ে যেতে দেখবে, কারণ সূর্য পূর্ব দিকে আগে ওঠে। পৃথিবী যেহেতু পশ্চিমে থেকে পূর্বে ঘুরছে তাই এরকমটা হয়।

(২) মূলমধ্যরেখা থেকে পশ্চিমে গেলে সময় পিছিয়ে যেতে দেখবে। কারণ পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় পরে হয়। এভাবে শুধু মূলমধ্যরেখা থেকে নয়, যেকোনো দুটি স্থান পরস্পর পরস্পরের পূর্বে বা পশ্চিমে থাকলে একই ঘটনা হবে।

(৩) একটি বৃত্তের মোট কোণ-এর পরিমাণ ৩৬০°। পৃথিবীও আবর্তনের সময় ৩৬০° কোণ ঘুরে আসে। সময় লাগে ২৪ ঘণ্টা। সুতরাং ১ ঘণ্টায় পৃথিবী ঘোরে ৩৬০°/২৪ ঘণ্টা =১৫°। অতএব ১° ঘুরতে সময় লাগে ৪ মিনিট।

প: ← বিকেল ৫টা → পূ:

তিনজনে তিনটি আলাদা দ্রাঘিমায় আছে। সাবিনা আর পিকু—কার সময় মন্দিরার চেয়ে এগিয়ে বা পিছিয়ে থাকবে বলতে পারো?

দ্রাঘিমারেখার পরিচয়

- দ্রাঘিমারেখা পরস্পর সমান্তরাল নয়।
- দ্রাঘিমারেখাগুলো অর্ধবৃত্ত।
- দুটি দ্রঘিমারেখার মধ্যে দূরত্ব নিরক্ষরেখার কাছে সবচেয়ে বেশি। নিরক্ষরেখার থেকে মেরুর দিকে ক্রমশ দুরুত্ব কমে যায়।
- দ্রঘিমারেখার মান মূলমধ্যরেখা থেকে পূর্বে বা পশ্চিমে ক্রমশ বাড়ে। পূর্বে ১৭৯ টি, পশ্চিমে ১৭৯ টি, মূলমধ্যরেখা ও ১৮০° দ্রাঘিমারেখাকে নিয়ে মোট দ্রাঘিমারেখার সংখ্যা ৩৬০ টি।
- ১৮০° পূর্ব এবং ১৮০° পশ্চিম যেহেতু একটাই দ্রাঘিমা রেখা, তাই তার পূঃ ও পঃ উল্লেখ করতে হয় না।

পৃথিবীর ছবি এঁকে দ্রাঘিমারেখা দেখাও।

জানার দৌড়ে পিছিয়ে থেকো না

মূলমধ্যরেখার ওপরে যখন সূর্য আসে তখন ঠিক দুপুর ১২ টা। মূলমধ্যরেখা থেকে ১৫° পূর্ব দ্রাঘিমায় তখন দুপুর ১ টা। আবার ১৫° পশ্চিম দ্রাঘিমায় সেই সময় সকাল ১১ টা। দ্রাঘিমা অনুযায়ী কোনো স্থানের সময় কে সেই স্থানের **স্থানীয় সময় (Local Time)** বলে। কোনো দ্রাঘিমায় সূর্য যখন ঠিক মাথার ওপর আসে, তখন দুপুর ১২টা হয়।

একটা গোটা দেশের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। যেমন, ভারতের পূর্ব সীমানা ও পশ্চিম সীমানার মধ্যে সময়ের পার্থক্য প্রায় ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট। একটা দেশের একটাই সময় ঠিক না করলে নানারকম অসুবিধা দেখা দেয়। তাই ভারতের ক্ষেত্রে এই অসুবিধা এড়াবার জন্য ঠিক মাঝ বরাবর ৮২°৩০' পূঃ দ্রাঘিমাকে **প্রমাণ দ্রাঘিমা (Standard meridian)** ধরা হয়েছে। ৮২°৩০' পূঃ দ্রাঘিমার স্থানীয় সময়কে সারা ভারতের প্রমাণ সময় **(Indian Standard Time)** বলে ধরা হয়। গ্রিনিচের সঙ্গে ভারতের প্রমাণ সময়ের পার্থক্য ৫ঘণ্টা ৩০ মিনিট। ভারত গ্রিনিচের পূর্ব দিকে অবস্থিত। কোনো অনুষ্ঠান যদি লন্ডনে বিকেল ৫ টায় শুরু হয় তবে ভারতের টেলিভিশনে সরাসরি দেখা যাবে[বিকেল ৫ টা + ৫ ঘণ্টা ৩০ মিনিট]= রাত্রি ১০টা ৩০ মিনিটে। তাহলে ভেবে দেখো লন্ডনে যখন বিকেলবেলা তখন ভারতে রাত হয়ে গেছে।

GPS

পৃথিবীর যেকোনো জায়গার অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা জানবার একটি অত্যাধুনিক ব্যবস্থা হল **GPS বা গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (Global Positioning System)**। পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে এই ব্যবস্থা কার্যকরী হয়। বর্তমানে জাহাজে, বিমানে, আধুনিক গাড়ি বা দামি মোবাইল ফোনে GPS থাকে।

মগজাস্ত্র.....

- অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার বৈশিষ্ট্যগুলোর তুলনা করে দেখাও।
- একই দ্রাঘিমারেখায় অবস্থিত জায়গাগুলোর স্থানীয় সময় এক হয় কেন?
- পৃথিবীর কোন দিকে গেলে সময় এগিয়ে যায় এবং কেন?
- লন্ডন অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ভারতে সরাসরি রাত ১১টা ৩০ মিনিটে শুরু হয়। লন্ডনে ওই অনুষ্ঠান কখন আরম্ভ হয়েছিল?
- ভূ-পৃষ্ঠের কোনো স্থানের অবস্থান কীভাবে নির্ণয় করা যায় তার একটি সহজ ব্যাখ্যা দাও। প্রয়োজনে চিত্র অঙ্কন করে বোঝাও।

আমি নন্দিনী। আমি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াই। আমাকে খুঁজে বার করো তো দেখি? খেলাটা কিন্তু মজার!!!

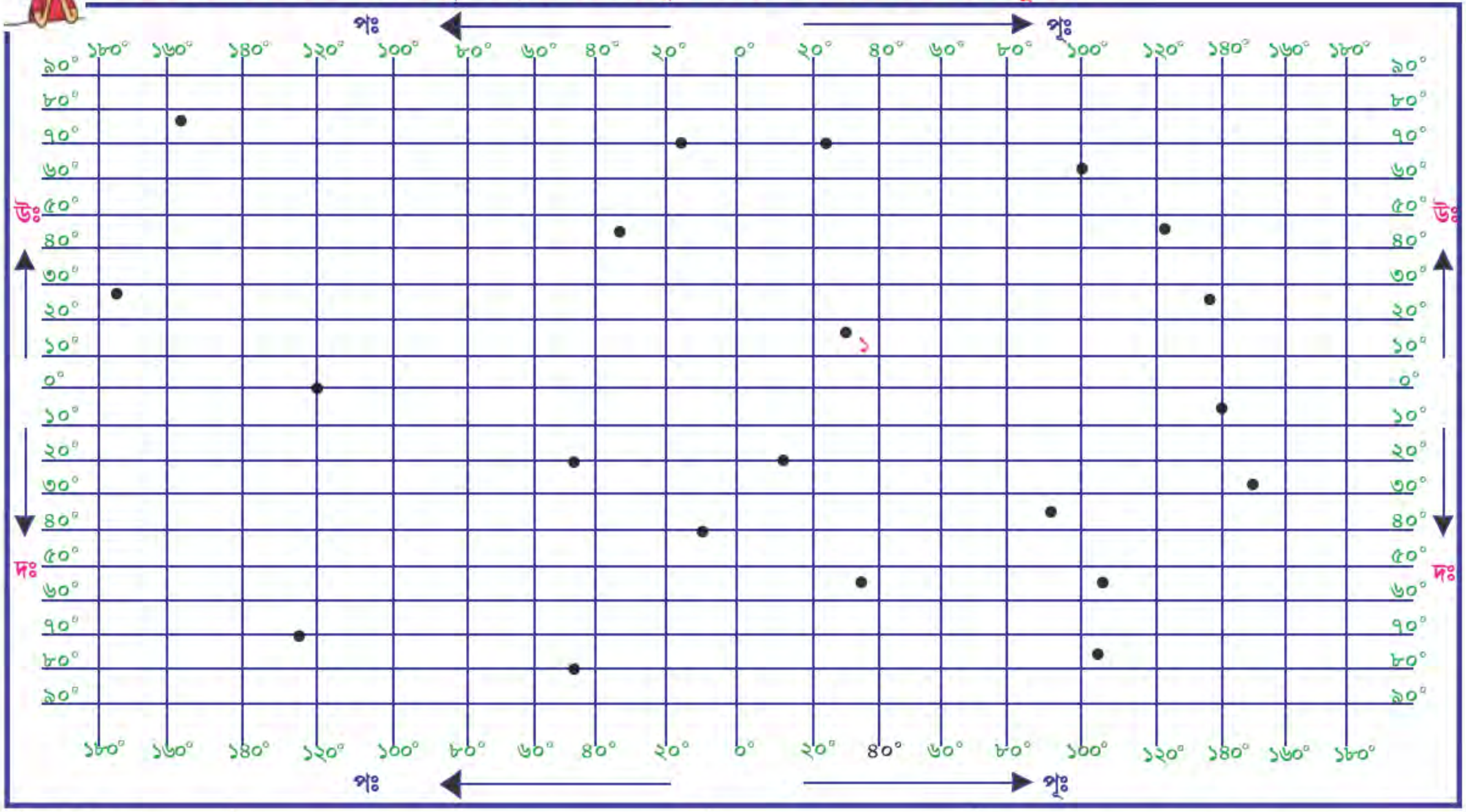

নন্দিনী আছে			
১. ১৮° উঃ, ৩০° পূঃ	৬. ৬৩° উঃ, ১০০° পূঃ	১১. ৩৬° দঃ, ৯০° পূঃ	১৬. ৭০° উঃ, ১৮° প
২. ২৭° উঃ, ১৭৫° পঃ	৭. ১০° দঃ, ১৫° পূঃ	১২. ৪০° দঃ, ১০° পঃ	১৭. ৫৬° দঃ, ৩৫° পূঃ
৩. ০°, ১২০° পঃ	৮. ৪৫° উঃ, ১২৫° পূঃ	১৩. ২৫° উঃ, ১৩৫° পূঃ	১৮. ১৮° দঃ, ৪৫° পঃ
৪. ৫৪° দঃ, ১০৫° পূঃ	৯. ৪৫° উঃ, ৩২° পঃ	১৪. ৭৫° উঃ, ১৫৫° পঃ	১৯. ৫° দঃ, ১৪০° পূঃ
৫. ৭০° দঃ, ১২৫° পঃ	১০. ২৭° দঃ, ১৫০° পূঃ	১৫. ৮০° দঃ, ৪৫° পঃ	২০. ৭৮° দঃ, ১০৫° পূঃ

উপরের ছকে বিভিন্ন জায়গার অবস্থান দেখানো হয়েছে। নীচের তালিকা দেখে বিন্দুর অবস্থান মিলিয়ে সংখ্যা বসাও। নমুনা লক্ষ করো।

বায়ুচাপ

- শ্বাস নেওয়ার সময় বুকটা ফুলে ওঠে? কারণ? শ্বাস নিয়ে তুমি বেশি বাতাস বুকে ঢোকাও, তাই ঐ বাতাসের জন্য বেশি জায়গা লাগে।

- বোতল বা গ্লাস থেকে সরু নলে করে যখন শরবত খাও তখন প্রথমে নলের ভেতরের বাতাস টেনে নাও বলেই ঐ ফাঁকা জায়গাটা ভরতে নলের মধ্যে জলটা উঠে আসে।

- বেলুনে বা সাইকেলের টিউবে হাওয়া ভরার সময় হাওয়া বেশি হয়ে গেলে কী হয়? - শব্দ করে ফেটে যায়।

- বাতাসের বর্ণ নেই, গন্ধ নেই, কিন্তু আয়তন আছে, ওজন আছে। বাতাস যখন বয়ে যায় তখন তাকে অনুভব করা যায়। গাছের পাতা নড়ে, নৌকার পাল ওড়ে, ঝড়ের সময় গাছপালা, ঘরবাড়ি ভেঙে যায়।

বায়ুর কি চাপ আছে?

একটা গ্লাসে জল ভর্তি করে একটা পোস্ট কার্ড বা কার্ডবোর্ড দিয়ে গ্লাসের মুখটা ঢেকে দাও। এবার কার্ডটা চেপে ধরে গ্লাসটাকে উপুড় করে দেখো জল পড়ল না! তাহলে কিছু একটা কার্ডবোর্ডটাকে ওপরের দিকে ঠেলে রাখছে তো? — বায়ুর চাপই আসলে জলকে পড়তে দিচ্ছে না।

এই মুহূর্তে যখন তুমি এই বইটা পড়ছো, জানো কি তোমার চারপাশের বাতাস তোমার উপর প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছে। প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে এই চাপ প্রায় ১ কিলোগ্রাম! আর প্রতি বর্গফুটে প্রায় ১টন।

তবুও তুমি এই প্রচণ্ড চাপ বুঝতে পারছো না কেন?

তোমার শরীরের ভিতরও বাতাস আছে। আর সেই বাতাসও বাইরের বাতাসের সমান এবং বিপরীত চাপ দিচ্ছে। তাই তুমি বাইরের বাতাসের চাপ বুঝতে পারছো না।

পৃথিবীর বাইরে মহাকাশে বা চাঁদে কোনো বাতাস নেই তাই মহাকাশচারীদের বিশেষ ধরনের পোশাকে বাতাস ভরা থাকে। তা না থাকলে তাদের শরীরের ভিতরের বাতাসের চাপে শিরা-ধমনি ফেটে যেতে পারে।

বায়ু চাপ দেয় কেন?

কঠিন,তরল বা গ্যাসীয় সব পদার্থই অসংখ্য অণু দিয়ে তৈরি। কঠিন বা তরল পদার্থকে আমরা দেখতে পেলেও, গ্যাসীয় পদার্থ বাতাসকে আমরা দেখতে পাই না। গ্যাসীয় পদার্থের অণুগুলো আলগাভাবে ঘুরে বেড়ায়,পরস্পরের মধ্যে ধাক্কা লাগায়, কোনো বস্তুর সঙ্গে বাতাসের এই অণুগুলোর যখন ধাক্কা লাগে,তখন এই ধাক্কার কারণে যে চাপ সৃষ্টি হয়, তাইই সাধারণভাবে বায়ুচাপ। আয়তন যত কমে অণুগুলোর মাঝের দূরত্ব তত কমে। ফলে ঘনত্ব বাড়ে, অণুগুলোর ধাক্কাও বাড়ে, যার ফলে চাপও বাড়ে।

দৈনন্দিন জীবনে এবং আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণে বায়ুচাপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

খুদে গোয়েন্দাদের জন্য ধাঁধাঁ, চটপট সমাধান করতে হবে!

দুটো মজার পরীক্ষা। প্রথমে নিজে করে দেখো, বুঝে নিয়ে তারপর বন্ধুদের অবাক করতে হবে!

- একটা বড়ো জলের বোতল বা দুধের বোতল, মুখ খোলা অবস্থায় টেবিলের ওপর শুইয়ে রাখো। এবার কাগজ পাকিয়ে ছোটো বল- এর মতো বানাও। বলটা যেন বোতল-এর খোলা মুখের প্রায় অর্ধেক মাপের হয়। এবার বলটাকে ফুঁ দিয়ে বোতলের মধ্যে ঢোকাবার চেষ্টা করে দেখো।

- বন্ধুদের সঙ্গে নিয়েও পরীক্ষাটা করে দেখতে পারো। যে যত জোরেই ফুঁ দিয়ে চেষ্টা করুক না কেন, বলটা কিছুতেই বোতলের মধ্যে ঢুকবে না। কেন ঢুকবে না বলোতো?

- আর একটা পরীক্ষা।

একটা কাচের গ্লাসের তলার দিকে কিছুটা কাগজ পাকিয়ে এমনভাবে আটকিয়ে রাখো, যাতে গ্লাসটা উপুড় করলেও কাগজটা না পড়ে। এবার একটা জল ভর্তি বড়ো গামলা বা বালতির মধ্যে গ্লাসটা উপুড় করে জলে ডুবিয়ে ধরে রাখো। গ্লাসের ভিতরের কাগজটা জলে ভিজে যাওয়া উচিত, তাইতো?

- জল থেকে তুলে দেখো তো ভিজলো কিনা। এবার গ্লাসটাকে জলে ডুবিয়ে দেখো, কাগজটা ভিজে যাবে।

- ভাবতে হবে, উপুড় করা গ্লাসে কাগজটা কেন ভিজছে না!
- বন্ধুদের সঙ্গে এই মজার পরীক্ষাটা করতে পারো। কে কাগজটা না ভিজিয়ে গ্লাসটাকে জলের মধ্যে ডোবাতে পারবে!

বায়ুচাপ কি সর্বত্র সমান ?

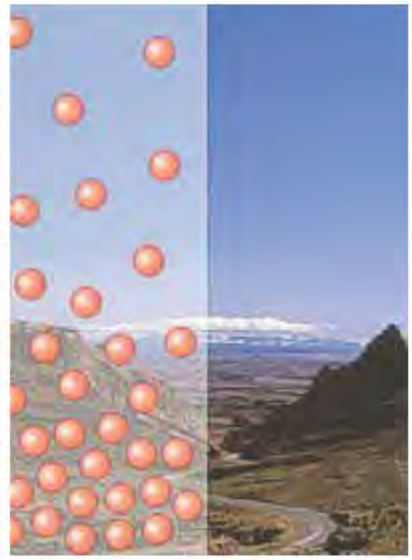

একটা স্পঞ্জকে হাতের মুঠোয় জোরে চেপে ধরো, তারপর ছেড়ে দাও। লক্ষ করো চেপে ধরলে স্পঞ্জটা আয়তনে ছোটো হয়ে গেলে আর ছেড়ে দিলে, আবার আগের মতো ফুলে উঠল।

ঠিক এমনটাই হয় আমাদের বায়ুমণ্ডলে। পৃথিবী পৃষ্ঠে বা সমুদ্র সমতলে বায়ুচাপ সবথেকে বেশি হয়। কারণ সমুদ্র সমতলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এবং উপরের স্তরের বায়ুর প্রবল চাপে বায়ুর অণুগুলো পরস্পরের কাছে চলে এসে বায়ুর ঘনত্ব বাড়িয়ে দেয়। ফলে বায়ুর চাপও বেশি হয়।

আবার উপরের স্তরের বায়ুর অণুগুলি পরস্পরের থেকে দূরে চলে যাওয়ায় বায়ুর ঘনত্ব কমে যায়। এই কারণে **উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর চাপও কমতে থাকে**।

পিকলুর ডায়েরি

বায়ুর চাপ সর্বমুখী, অর্থাৎ বায়ু কোনো বস্তুর উপর সবদিক থেকে চাপ দেয়। সমুদ্র সমতলে বায়ুর চাপ ৭৬ সেমি পারদস্তম্ভের চাপের সমান। বায়ুর চাপ মাপা হয় মিলিবার এককে (১ মিলিবার ০·০২৯৫৩ ইঞ্চি পারদস্তম্ভের চাপের সমান)। সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুচাপ ১০১৩·২৫ মিলিবার।

বায়ুর চাপ মাপার যন্ত্র হলো ব্যারোমিটার। ১৬৪৩ সালে বিজ্ঞানী টরিসেলির আবিষ্কৃত সূত্র অনুসারে পারদ ব্যারোমিটার তৈরি হয়। এর মাধ্যমে বায়ু চাপের তারতম্য পরিমাপ করা যায়। একটা পারদভর্তি পাত্রে একটা এক মুখ বন্ধ পারদ ভর্তি কাঁচের নল উপুড় করে বসানো থাকে। বায়ুর স্বাভাবিক চাপে কাঁচ নলের মধ্যে প্রায় ৭৬ সেমি পারদ থাকে। বায়ুচাপ কমলে পারদ নেমে যায়। আর চাপ বাড়লে পারদস্তম্ভের উচ্চতা বাড়ে।

কী হবে দেখো !

একটা স্কেলকে টেবিলের কাণায় এমন ভাবে রাখো যাতে স্কেলের বেশির ভাগ অংশ টেবিলের বাইরে বেরিয়ে থাকে। এবার স্কেলের বাইরের প্রান্তটায় একটু টোকা মারলেই স্কেলটা পড়ে যাবে।

এবার একটা খবরের কাগজ স্কেলের টেবিলের উপর থাকা অংশটার ওপর বিছিয়ে দিয়ে একটু চেপে দাও। তারপর টোকা মেরে দেখো কী হয়!

কী হয় দেখো!

একটা কিছুটা জলভরা প্লাস্টিকের বোতলের মুখটা ভালো করে পাতলা পলিথিন বা কর্কের ছিপি দিয়ে আটকে দাও। একটা সরু নল ছিপিটার মধ্যে দিয়ে বোতলের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। এবার নলটার মধ্যে দিয়ে বোতলের ভিতর জোরে কয়েকবার ফুঁ দাও।

এবার আমরা দুটো গল্প পড়বো, তারপর দুটো প্রশ্ন। খুদে বিজ্ঞানীরা মগজাস্ত্র নিয়ে লেগে পড়ো।

আজ দিনটা ভীষণ গরম ছিল। সারাদিন খাঁ খাঁ রোদ। সৃজন স্কুল থেকে ফিরে বিকেলটা মাঠেই খেলে রোজ। কিন্তু আজ আর মা তাকে মাঠে যেতে দিলেন না। কারণ, আকাশ জুড়ে কালো মেঘ, আশপাশটা কেমন থমথমে হয়ে আছে, গাছের একটা পাতাও নড়ছে না। হঠাৎ ঝড় উঠলো। জানালা দরজায় প্রচণ্ড জোরে বাতাস আছড়ে পড়তে থাকলো। বৃষ্টি শুরু হলো। বলোতো, ঝড় ওঠার আগে আশপাশটা এরকম থমথমে হয়ে থাকে। একটুও বাতাস বয় না কেন?

পুজোর ছুটিতে ঝিনুক বাবা মায়ের সঙ্গে বেড়াতে গেল গোমুখে। গঙ্গা নদীর উৎস গোমুখ তুষার গুহা, হিমালয় পর্বতের খুব উঁচুতে (প্রায় ৩৯০০ মিটার উঁচুতে) অবস্থিত। জায়গাটা খুব সুন্দর কিন্তু ঝিনুকের মন খারাপ। কারণ, খাওয়া দাওয়ার অসুবিধা। চাল- ডাল কিছুই ভালো করে সিদ্ধ হচ্ছে না। বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে বলল উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলে এরকম অসুবিধা হয়। ভেবে দেখোতো, উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলে চাল, ডাল সিদ্ধ করতে সমস্যা হয় কেন?

বায়ুচাপের পার্থক্যের কারণ

একটা পানীয় জলের প্লাস্টিকের বোতলে অর্ধেকের বেশি গরম জল দিয়ে ভর্তি করে, ঢাকনা আটকে রেখে দাও। কয়েক ঘণ্টা পরে দেখলে বোতলটা একটু তুবড়ে গেছে। কারণ বোতলে গরম জল ভরার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের বাতাস গরম হয়ে কিছুটা বেরিয়ে গেছে। বাকি বাতাস ঠান্ডা হয়ে, সংকুচিত হয়ে ভিতরে শূন্যস্থান তৈরি হয়েছে। তখন বাইরের বাতাসের চাপে বোতলটা তুবড়ে গেছে।

বায়ুর উষ্ণতার পরিবর্তন হলে বায়ুর আয়তন, ঘনত্বের পরিবর্তন হয়। যেমন- বায়ু উত্তপ্ত হলে বায়ুর অণুগুলো গতিশীল হয়ে পড়ে এবং পরস্পরের থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। এভাবে উষ্ণ বায়ু হালকা হয়ে প্রসারিত হয় এবং ওপরে উঠে যায়। বায়ুর ঘনত্ব কমে যায়। অর্থাৎ নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে অণুর সংখ্যাও কমে যায় এবং বায়ুর চাপও কমে যায়। বায়ু শীতল হলে সংকুচিত হয় এবং বায়ুর ঘনত্ব বেড়ে যায়। তাই বায়ুর চাপও বেড়ে যায়। একারণেই শীতল মেরু অঞ্চলে বায়ুর চাপ বেশি এবং উষ্ণ নিরক্ষীয় অঞ্চলে বায়ুর চাপ কম হয়।

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ এবং উপরের বায়ুর স্তরের প্রবল চাপে বায়ুর অণুগুলো ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি বেশি পরিমাণে থাকে, আর যত উপরের দিকে যাওয়া যায়, তত পরস্পর থেকে দূরে ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ **ভূমির উচ্চতা** বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর ঘনত্ব কমে এবং বায়ুর চাপও কমে। প্রতি ১১০ মিটার উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ১ সেমি পারদ স্তম্ভের সমান বায়ুচাপ কমতে থাকে। একারণেই উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে জলের স্ফুটনাঙ্ক কমে যায়। অর্থাৎ বায়ুচাপ কমলে জল ১০০° সে. এর কম উষ্ণতাতেই ফুটতে শুরু করে। তাই কোনো কিছু সিদ্ধ হতে অসুবিধা হয়।

জানো কী?

উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে অথবা বেশি উচ্চতায় বাতাসের পরিমাণ কম হওয়ায়, বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণও এতো কমে যায় যে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। এ কারণেই পর্বতারোহীরা সঙ্গে অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে যায়।

বায়ুতে **জলীয়বাষ্প** থাকলে, ঐ বায়ু জলীয়বাষ্পহীন বায়ুর থেকে হালকা হয়। তাই বায়ুর চাপও কম হয়। জলীয়বাষ্প বায়ুতে মিশলে যে নিম্নচাপ তৈরি হয়, (অর্থাৎ বায়ুর চাপ কমে যায়) তার ফলেই

আবহাওয়া অশান্ত হয়ে ঝড়,বৃষ্টি, দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হয়। আর জলীয়বাষ্পের অভাবে, বাতাস বেশি ভারী হওয়ার কারণে উচ্চচাপ তৈরি হয়।

- একটা লাট্টু বা বলকে ঘুরিয়ে দিয়ে, তার গায়ে যদি ছোট্ট কাগজের বল ছুঁড়ে দাও, তাহলে কাগজের বলটা ছিটকে যাবে। ঠিক এভাবেই **পৃথিবীর আবর্তনগতির** জন্য পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাতাস বাইরের দিকে ছিটকে যায়। নিরক্ষরেখার কাছাকাছি অঞ্চলে আবর্তন বেগ সবথেকে বেশি হয় বলে, এই অঞ্চলের বাতাস দুই ক্রান্তীয় অঞ্চলের দিকে ছিটকে যায়। এভাবে নিরক্ষীয় অঞ্চলে নিম্নচাপ তৈরি হয়। আর দুই ক্রান্তীয় অঞ্চলে তৈরি হয় উচ্চচাপ।

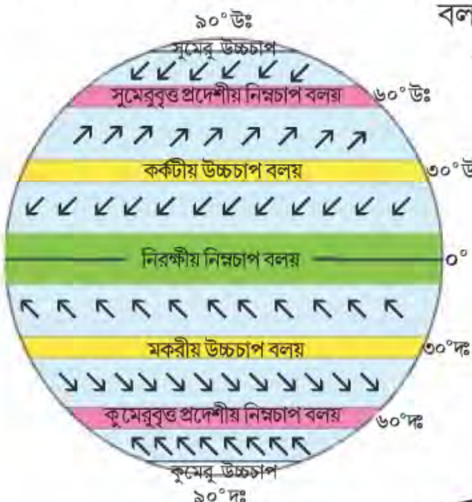

সমচাপ রেখা

পাশের ছবিটাতে আঁকাবাঁকা কালো কালো রেখাগুলো কী বলোতো? প্রতিদিন আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্যগুলোকে আবহাওয়া মানচিত্রে দেখানো হয়। এই মানচিত্রে আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদান যেমন (উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত,বায়ুরচাপ, বায়ুর আর্দ্রতা) প্রভৃতি দেখানো হয়। আবহাওয়া মানচিত্রে বায়ুচাপ দেখানোর জন্য এই কালো আঁকা-বাঁকা রেখা ব্যবহার করা হয়।

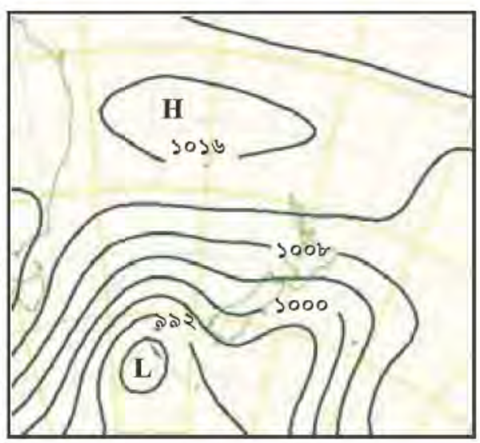

নির্দিষ্ট সময়ে একই পরিমাণ বায়ুচাপযুক্ত অঞ্চলগুলোকে মানচিত্রে যে কাল্পনিক রেখা দ্বারা যুক্ত করা হয়, তাকে সমচাপ রেখা বলে।

বৈশিষ্ট্য :

১. সমচাপ রেখায় বায়ুচাপকে মিলিবার (mb) এককে দেখানো হয়। পৃথিবীতে বায়ুচাপ সাধারণত ৯৮০ mb থেকে ১০৫০ mb দেখা গেছে।

২. সমচাপ রেখায় সাধারণত বায়ুচাপের পরিমাণগুলো সমুদ্র পৃষ্ঠের বায়ুচাপের হিসাবে দেখানো হয়।

৩. সমচাপ রেখাগুলো পরস্পরকে স্পর্শ বা অতিক্রম করতে পারে না।

৪. সমচাপ রেখাগুলো যেখানে পরস্পরের খুব কাছাকাছি চলে আসে, সেই অঞ্চলে বায়ুর চাপের পার্থক্য বেশি।

বায়ুর উচ্চচাপ এবং নিম্নচাপ

সমচাপ রেখার ছবিটাতে লক্ষ করো কোথাও লেখা রয়েছে 'L' আবার কোথাও 'H' । যে সব স্থানের বায়ুর চাপ আশপাশের বায়ুচাপের থেকে বেশি, তাকে উচ্চচাপ অঞ্চল (High Pressure Area বা সংক্ষেপে 'H') বলে। আবার যেখানে বায়ুচাপ আশপাশের থেকে কম, তাকে নিম্নচাপ অঞ্চল (Low Pressure Area বা সংক্ষেপে 'L') বলে।

বায়ুর উচ্চচাপ

- যে সমস্ত অঞ্চলে বায়ুর উষ্ণতা কম, অর্থাৎ পৃথিবীর শীতল অঞ্চলগুলোতে বায়ুর উচ্চচাপ দেখা যায়। যেমন-শীতল নাতিশিতোষ্ণ অঞ্চল, মেরু অঞ্চল।
- উচ্চচাপের বায়ু শীতল হওয়ায় বায়ু সংকুচিত হয়
- বায়ুর নিমজ্জন এর কারণেও বায়ুর উচ্চচাপ সৃষ্টি হয় অর্থাৎ শীতল অঞ্চলে বাতাস ঠান্ডা ও ভারী হয়ে ভূ-পৃষ্ঠের দিকে নেমে আসে। এভাবে ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি বায়ু বেশি ঘন হয়, তাই চাপ ও বাড়ে।
- শীতল ও ভারী বাতাসে জলীয় বাষ্প খুবই কম থাকে। একারণে উচ্চচাপ অঞ্চলে সাধারণত মেঘ, বৃষ্টি কিছুই হয় না। পরিষ্কার ও শান্ত আবহাওয়া থাকে।

বায়ুর নিম্নচাপ

- যে সমস্ত অঞ্চলে বায়ুর উষ্ণতা বেশি অর্থাৎ উষ্ণ অঞ্চলগুলিতে বায়ুর নিম্নচাপ দেখা যায়। যেমন- নিরক্ষীয় অঞ্চল, ক্রান্তীয় অঞ্চল।
- নিম্নচাপের বায়ু উষ্ণ হওয়ায় বায়ু প্রসারিত ও হালকা হয় ।
- বায়ুর উর্ধ্বগমনের কারণেও বায়ুর নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ উষ্ণ অঞ্চলে ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি বায়ুও হালকা হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। এভাবে ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি বায়ুর ঘনত্ব কমে যায়, তাই বায়ু চাপও কমে।
- উষ্ণ বায়ু উপরের স্তরে শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এলে, বায়ুর মধ্যে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে জল বা বরফকণায় পরিণত হয়। এ কারণে নিম্নচাপ অঞ্চলে মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়, অশান্ত আবহাওয়া দেখা যায়।

বাতাস বয়ে যায়——

এক গ্লাস জল টেবিলের উপর ঢেলে দিলে কী হবে? জল উঁচু থেকে নিচু জায়গার দিকে গড়িয়ে যেতে শুরু করবে।

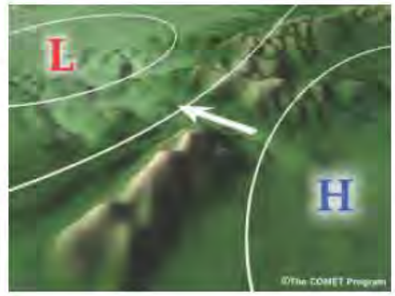

এইভাবেই, বায়ুও উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে বয়ে যায়। অর্থাৎ বায়ুর চাপের পার্থক্যই বায়ুপ্রবাহের প্রধান কারণ। আবার বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমেই পৃথিবীতে উচ্চচাপ এবং নিম্নচাপ অঞ্চলের মধ্যে বায়ুচাপের সমতা বা ভারসাম্য বজায় থাকে। বায়ুচাপের পার্থক্য যত বেশি হয়, অর্থাৎ নিম্নচাপ অঞ্চলে বায়ুচাপ যত বেশি কমে যায়, বায়ুচাপ সমান করার জন্য আশেপাশের উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে বায়ু তত বেশি গতিবেগে ঐ অঞ্চলের দিকে ছুটে আসে। প্রবল বেগে ছুটে আসা বাতাস বিধ্বংসী রূপ নিলে, তাকে সাইক্লোন,টাইফুন, হ্যারিকেন, টর্নেডো প্রভৃতি বলা হয়।

হাতে কলমে

মাউন্ট এভারেস্ট

- উচ্চতা– ৮৮৪৮ মি.
- উষ্ণতা— -৯° সে.
- বায়ুচাপ— ৯৩০ মিলিবার

পুরীর সমুদ্রসৈকত

- উচ্চতা— ০ মিটার
- উষ্ণতা— ২০° সে.
- বায়ুচাপ– ১০০০মিলিবার

☛ এই দুটো জায়গার আবহাওয়া কেমন হতে পারে? পুরীর সমুদ্রসৈকত থেকে মাউন্ট এভারেস্ট গেলে, রোজকার জীবনে কীরকম পরিবর্তন হবে?

☛ সাম্প্রতিককালে, তোমার জেলায়, রাজ্যে বা দেশে ঘটে যাওয়া কোনো ঝড় বা সাইক্লোনের ছবি এবং লেখা সংবাদপত্র থেকে সংগ্রহ করে কোলাজ করে তোমার খাতায় আটকে ক্লাসে সবাইকে দেখাতে পারো।

ভূমিরূপ

'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতায় আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ছেলেমেয়েরা এসে জড়ো হয়েছে কলকাতায়। হাসান শেখ, সোহা মুর্মু, বরুণ তামাং, এলিনা রায়—আরও কত সব নাম। প্রত্যেকেই তার নিজের নিজের অঞ্চলের ছবি এঁকেছে।

বরুণের ছবি

সোহার ছবি

এলিনার ছবি

☞ তোমার বাড়ির আশপাশের অঞ্চলটা কি এই ছবিগুলোর কোনোটার মতো ?

আমাদের এই পৃথিবীর উপরটা (ভূ-পৃষ্ঠ) সব জায়গায় একইরকম নয়। কোথাও উঁচু, কোথাও ঢেউ খেলানো আবার কোথাও বা নিচু সমতল। পৃথিবী পৃষ্ঠের ভূমির এই বৈচিত্র্যই হলো '**ভূমিরূপ**' (**Landform**)।

একটা মজার খেলা

—ছবিগুলো দেখে খিদে খিদে পাচ্ছে? কিন্তু **মজার খেলাটা** খেলতে হবে তো!

১. একটা চৌকো কাগজকে উপরের দিকটা ভাঁজ করে তিনকোণা করো।

- লক্ষ করো উপরের দিকটা কেমন উঁচু আর ধীরে ধীরে সরু হয়ে গেছে।

২. এবার এই তিনকোণা কাগজটার উপরের সরু অংশটা একটু ভাঁজ করে নাও।

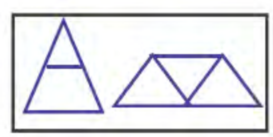

- এবার দেখো উপরের উঁচু সরু অংশটা আর নেই। বরং চ্যাপ্টা, নিচু হয়ে গেছে।

৩. আরও একবার কাগজের উপরের দিকটাকে ভাঁজ করে দেখো।

- এবার উপরের দিকটা কেমন সমতল আর আরও নিচু হয়ে গেছে!

উচ্চতা, গঠন এবং বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পৃথিবীতে প্রধানত তিনরকম ভূমিরূপ দেখা যায়। ভূ-পৃষ্ঠের সব থেকে উঁচু অংশ হলো পর্বত, মাঝারি উঁচু অংশ মালভূমি। আর সব থেকে নিচু, প্রায় সমতল অংশ সমভূমি।

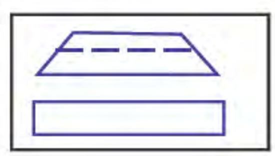

ভূপৃষ্ঠের সবজায়গা এক রকম নয় কেন?

- পৃথিবীর ওপর কোথাও পাহাড়, কোথাও মালভূমি, আবার কোথাও সমভূমি। এই সমস্ত রকম ভূমিরূপ মূলত দুরকম শক্তির দ্বারা তৈরি হয়েছে। একটা হলো পৃথিবীর **ভিতরকার শক্তি বা অভ্যন্তরীণ শক্তি**। আর অন্যটা **বাইরের শক্তি বা বহির্জাত শক্তি**।

☛ জানো কি, তুমি যে ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আছো, সেটা স্থির নয়! ভূ-অভ্যন্তরে সারাক্ষণই আলোড়ন হচ্ছে। ভূ-পৃষ্ঠ অনেকগুলো ছোটো, বড়ো পাত নিয়ে গঠিত (চায়ের প্লেট ভাঙলে যেরকম টুকরো হয়ে যায়, ঠিক সেরকম)। মহাদেশ এবং মহাসাগরগুলো এই পাতগুলোর উপরে আছে। আর পাতগুলো একটা থকথকে (সান্দ্র) স্তরের(অ্যাসথে-নোস্ফিয়ার) ওপর ভাসছে। ভাসতে ভাসতে পাতগুলো কখনো পরস্পরের দিকে এগিয়ে এসে ধাক্কা খায়, আবার কখনো দূরে সরে যায়, তখন ভূ-আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এটাই পৃথিবীর ভিতরকার শক্তি। এর ফলে পাহাড়, পর্বত, মালভূমি, সমভূমি সবরকম ভূমিরূপ তৈরি হয়। আর বাইরের শক্তি হলো নদী, বায়ু, হিমবাহ, সমুদ্র তরঙ্গের শক্তি। এই সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তিগুলো ভূমিরূপ-এর ওপর সবসময় কাজ করে কখনও ক্ষয় করে উচ্চতা কমিয়ে দেয়, আবার কোথাও সঞ্চয় করে ভূমিরূপ এর বৈচিত্র্য তৈরি করে।

☛ আঁকা প্রতিযোগিতার দিন বরুণ তামাং বলছিল 'আমাদের দার্জিলিং খুব সুন্দর—চারদিকে কত উঁচু উঁচু পর্বতের চূড়া, কয়েকটা এত উঁচু যে মেঘে ঢাকা থাকে। কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় তো বরফ জমে থাকে। আর কি প্রচণ্ড ঠান্ডা— দিনের বেলাতেও সোয়েটার পরে থাকতে হয়!'

- পৃথিবীজুড়ে পর্বতের উচ্চতা এবং আকৃতির অনেক বৈচিত্র্য আছে। এর কারণ পর্বত সৃষ্টির প্রক্রিয়া এবং সময়ের পার্থক্য। একারণেই হিমালয়, আল্পস ইত্যাদি নবীন পর্বতগুলো অনেক উঁচু এবং সূঁচালো চূড়াযুক্ত হয়। অন্য দিকে আরাবল্লীর মতো প্রাচীন পর্বতগুলো বহু বছর ধরে ক্ষয়ের ফলে উচ্চতা কমে যাওয়ায় চূড়াগুলো তেমন সূঁচালো নয়। উৎপত্তি অনুযায়ী পর্বত প্রধানত তিন ধরনের হয়।

এশিয়া মহাদেশের হিমালয়, ইউরোপের আল্পস, উত্তর

আমেরিকার রকি, দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বতমালা-সবই **ভঙ্গিল পর্বত (Fold Mountain)**।

কীভাবে সৃষ্টি হলো ভঙ্গিল পর্বত?

নিজেই বানিয়ে ফেলো ভঙ্গিল পর্বত! প্রথমে টেবিলের ওপর চার-পাঁচটা চৌকো কাগজ রাখো। এবার কাগজগুলোর দুধারে হাত দিয়ে ধীরে ধীরে মাঝখানের দিকে ঠেলতে শুরু করো। লক্ষ করো কাগজগুলো ক্রমশ ভাঁজ হয়ে ওপরের দিকে উঁচু হয়ে উঠছে। মাদুর বা কার্পেট নিয়েও পরীক্ষাটা করে দেখতে পারো।

অর্থাৎ এক্ষেত্রে তোমার হাত দুটো ভাসমান পাত। ঠিক এইভাবেই পাতদুটোর প্রবল চাপে মাঝখানের ভূ-ভাগ ভাঁজ খেয়ে উঁচু হয়ে উঠে ভঙ্গিল পর্বত এর সৃষ্টি হয়।

○ আর একধরনের পর্বত হলো **স্তূপ পর্বত (Block Mountain)**। ভূ- আলোড়নের ফলে ভূপৃষ্ঠে অনেক সময় ফাটল সৃষ্টি হয়। পরবর্তী কোনো ভূআলোড়নের ফলে এই ফাটলগুলোর মাঝের ভূখণ্ড উঁচু হয়ে উঠে যেতে পারে, অথবা দুপাশের ভূখণ্ড নীচে বসে গিয়ে মাঝখানের ভূখণ্ড স্তূপ এর মতো পর্বত সৃষ্টি করতে পারে। ভারতের সাতপুরা পর্বত, জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্ট এবং ফ্রান্সের ভোজ এরকম স্তূপ পর্বত।

○ আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাতের সময় প্রচুর লাভা, ছাই, ছোটো ছোটো পাথর বেরিয়ে এসে আগ্নেয়গিরির চারদিকে জমা হয়ে তিনকোণা শঙ্কুর মতো একরকমের পর্বত সৃষ্টি হয় যাকে বলে **আগ্নেয় পর্বত (Volcanic Mountain)**। ইতালির ভিসুভিয়াস, এটনা, আফ্রিকার কিলিমাঞ্জারো, জাপানের ফুজিয়ামা, ইন্দোনেশিয়ার ক্রাকাতোয়া এরকম আগ্নেয় পর্বত।

- সাধারণত ৯০০ মিটারের বেশি উঁচু, অনেকদূর বিস্তৃত, শিলা দ্বারা গঠিত ভূমিরূপই হলো **পর্বত (Mountain)**।
- পৃথিবীর স্থলভাগের প্রায় চার ভাগের এক ভাগ পর্বতময়।
- পর্বতের বেশিরভাগ অংশই খাড়া ঢালযুক্ত আর খুব উঁচু নিচু হয়।
- পর্বতের উপরের দিকের সরু, সূঁচালো অংশটা হলো **পর্বতশৃঙ্গ** বা **চূড়া**। হিমালয় পর্বতের মাউন্ট এভারেস্ট (৮,৮৪৮ মিটার উঁচু) পৃথিবীর সবথেকে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ।
- দুটো পর্বতচূড়ার মাঝখানের নিচু খাতের মতো অংশটা হলো **পর্বত উপত্যকা**।
- এরকম অনেকগুলো পর্বত শৃঙ্গ আর উপত্যকা বিরাট অঞ্চল জুড়ে অবস্থান করলে **পর্বতশ্রেণি** তৈরি হয়।
- এরকম অনেকগুলো পর্বতশ্রেণি বিভিন্ন দিক থেকে এক জায়গায় এসে মিশলে, **পর্বতগ্রন্থি** তৈরি হয়।

দুদিক মিলছে না! মিলিয়ে লেখো

➲ এটনা	ভঙ্গিল পর্বত
➲ আল্পস	আগ্নেয় পর্বত
➲ ব্ল্যাকফরেস্ট	ভঙ্গিল পর্বত
➲ হিমালয়	স্তূপ পর্বত

সোহার বাড়ি বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতনে। ওখানকার লাল, কাঁকর বিছানো মাটি, উঁচু নিচু ঢেউ খেলানো পাথুরে জমি, শাল-পলাশ-মহুয়ার বন, কোপাই নদীর জলে সূর্যের অস্ত যাওয়া- এসবই ওর ভীষণ প্রিয়। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলো—বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের কিছু অংশ মালভূমি অঞ্চল।

☞ উৎপত্তি আর অবস্থান অনুসারে মালভূমির আকৃতি, প্রকৃতিরও প্রচুর বৈচিত্র্য আছে।

- **পর্বতবেষ্টিত মালভূমি (Intermontane Plateau)** গুলো সবথেকে উঁচু আর বিস্তৃত হয়। হিমালয় এবং কুয়েনলুন পর্বত শ্রেণির মধ্যে অবস্থিত তিব্বত মালভূমি (৩,৬৫৫ মিটার উঁচু) পৃথিবীর বৃহত্তম মালভূমি।

- দঃ আফ্রিকা, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া, আন্টার্কটিকা, গ্রিনল্যান্ড এর বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে আছে **মহাদেশীয় মালভূমি (Continental Plateau)**।

- অগ্ন্যুৎপাতের সময় গরম লাভা বেরিয়ে এসে অনেকদূর ছড়িয়ে পড়ে বিরাট মালভূমি সৃষ্টি করে। ভারতের দাক্ষিণাত্য মালভূমি, মালব মালভূমি এরকম **লাভাগঠিত মালভূমি (Volcanic Plateau)**।

- নদী উপত্যকা দ্বারা বিচ্ছিন্ন মালভূমি হলো **ব্যবচ্ছিন্ন**

- আশপাশের অঞ্চলের সাপেক্ষে হঠাৎ উঁচু (সাধারণত ৩০০ মিটারের বেশি উঁচু) বিস্তীর্ণ ভূভাগ, যার চারিদিকে খাড়া ঢাল আছে, এরকম ভূমিরূপ হলো **মালভূমি (Plateau)**।

- স্থলভাগের বেশিরভাগ জায়গা জুড়েই রয়েছে মালভূমি। এশিয়া, আফ্রিকা, উঃ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার বেশিরভাগ অংশ জুড়েই বড়ো বড়ো মালভূমি আছে।

- মালভূমির উপরটা সমতল, ঢেউ খেলানো থেকে উঁচু নিচুও হতে পারে।

- মালভূমি অনেকটা তোমার পড়ার টেবিলের মতো। উপরটা টেবিলের মতোই প্রায় সমতল হলেও, ধারগুলো টেবিলের পায়ার মতোই ঢালু এবং খাড়া। এজন্য মালভূমিকে '**টেবিল ল্যান্ড**' বলে।

মালভূমি (Dissected Plateau)। ছোটোনাগপুর মালভূমি এই ধরনের। পশ্চিমবঙ্গের মালভূমির অঞ্চল ছোটোনাপুরের অংশ। মালভূমির গড় উচ্চতা ৩০০ মিটার হলেও, কিছু উঁচু মালভূমির উচ্চতা অনেক বেশি। **পামীর মালভূমি** (৪,৮৭৩ মিটার উঁচু) পৃথিবীর সর্বোচ্চ মালভূমি বলে একে '**পৃথিবীর ছাদ**' বলা হয়। তিব্বত মালভূমি, ভারতের লাডাক মালভূমি সবই উচ্চ মালভূমি।

এলিনা কলকাতার মেয়ে। তোমরা যারা কলকাতা বা আশেপাশের জেলাগুলোতে থাকো, নিশ্চয়ই লক্ষ করেছো এখানকার ভূমি আদৌ উঁচুনিচু নয়, বরং অনেক বেশি সমতল।

☞ পৃথিবীর ভিতরকার শক্তি এবং বাইরের প্রাকৃতিক শক্তি দুধরনের প্রভাবেই অনেক ধরনের সমভূমি সৃষ্টি হয়।

- নদী, সমুদ্র, হ্রদে দীর্ঘদিন ধরে পলি জমে **পলিগঠিত সমভূমি (Alluvial Plain)** সৃষ্টি হয়। ভারতের সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সমভূমি এরকম সমভূমি।

- আগ্নেয়গিরির লাভা জমে **লাভা সমভূমি (Lava Plain)** তৈরি হয়। দাক্ষিণাত্যের উত্তর অংশের সমভূমি লাভা সমভূমি।

- মরুভূমির বালি বহুদূরে উড়ে গিয়ে সঞ্চিত হয়ে তৈরি হয় **লোয়েস সমভূমি (Loess Plain)**।

- কোনো নিচু, সমতল, বিস্তীর্ণ ভূমিরূপ হলো **সমভূমি (Plain)**।
- প্রায় প্রতিটি মহাদেশেই বিস্তীর্ণ সমভূমি আছে। এশিয়ার গাঙ্গেয় সমভূমি, আফ্রিকার নীলনদের সমভূমি, উঃ আমেরিকার প্রেইরি, দঃ আমেরিকার পম্পাস পৃথিবীর বিখ্যাত সমভূমি অঞ্চল।
- সমভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে খুব বেশি উঁচু হয় না (৩০০ মিটারের কম হয়)।
- সমভূমির উপরিভাগ সমতল বা সামান্য ঢেউ খেলানো হয়।
- পৃথিবীর বেশিরভাগ সমভূমি নদীর পলি সঞ্চয়ের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। একারণে এই উর্বর সমতল ভুভাগগুলোতে সবথেকে বেশি মানুষ বাস করে।

'মগজাস্ত্র' -ধরতে পারলেই লিখতে পারবে!

পর্বত	মালভূমি	সমভূমি
উচ্চতা -------------	উচ্চতা -------------	উচ্চতা ৩০০ মিটারের কম।
বৈশিষ্ট্য -------------	চারি দিকে খাড়া ঢাল আছে	বৈশিষ্ট্য -------------
মাউন্ট এভারেস্ট সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ	সর্বোচ্চ মালভূমি --------- --------------------	
বৈশিষ্ট্য------------- --------------------	বৈশিষ্ট্য------------- --------------------	উপরের সমতল বা সামান্য ঢেউ খেলানো হতে পারে।
প্রকারভেদ ------------ ---------------------	লাভা গঠিত মালভূমি, পর্বতবেষ্টিত মালভূমি।	প্রকারভেদ ------------- ---------------------
আল্পস, আন্দিজ, ফুজিয়ামা, এটনা	উদাহরণ -------------	উদাহরণ -------------

❐ পর্বত-মালভূমি-সমভূমি— আমাদের জীবনে প্রভাব কতখানি !

ভূমিরূপের সঙ্গে মানুষের জীবনের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। ভূমির প্রকৃতি যেখানে যেমন-— মানুষ সেরকম ভাবেই মানানসই জীবনযাত্রা গড়ে তোলে। ভূমি মানুষের জীবন, জীবিকা, অর্থনৈতিক কাজকর্ম, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারক এবং নিয়ন্ত্রক।

আমাদের জীবনে ভূমিরূপের প্রভাব

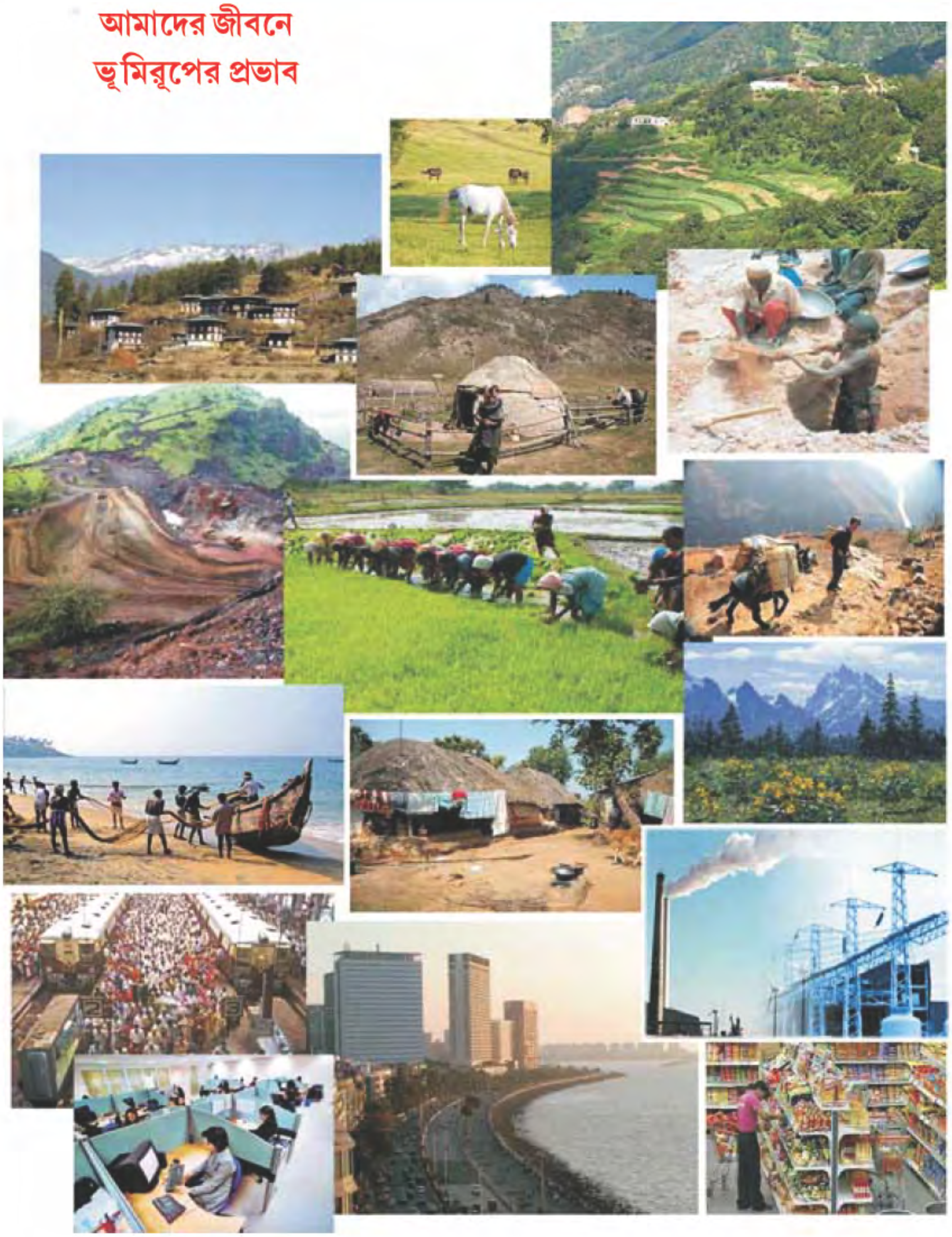

• উঁচু পর্বতের বরফ-গলা জল থেকে প্রচুর নদী সৃষ্টি হয়। এই নদীগুলো থেকে সারাবছর জল পাওয়া যায়। যেমন হিমালয় পর্বত থেকে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু নদীর উৎপত্তি হয়েছে।

• জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস পর্বতে বাধা পেয়ে বৃষ্টি হয়। হিমালয় পর্বতে বাধা পেয়ে দঃ পঃ মৌসুমি বায়ু ভারতে বৃষ্টিপাত ঘটায়।

• পর্বত বিরাট প্রাচীরের মতো উষ্ণ এবং শীতল বায়ুপ্রবাহকে আটকাতে পারে। শীতকালে সাইবেরিয়ার তীব্র ঠান্ডা বাতাসকে বাধা দিয়ে হিমালয় ভারতে শীতের তীব্রতা কমিয়ে দেয়।

• পার্বত্য অঞ্চলে সাধারণত মূল্যবান নরম কাঠের বনভূমি গড়ে ওঠে।

• পর্বতের ঢালগুলোয় ভালো পশুচারণ ক্ষেত্র পাওয়া যায়। পর্বতের ঢালে ধাপ কেটে চাষবাসও করা যায়।

• পার্বত্য অঞ্চলের খরস্রোতা নদীগুলো জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সহায়ক।

• কিছু কিছু পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। পর্বতের শিলা, বোল্ডার, বড়ো ছোটো পাথর—সবই ঘরবাড়ি তৈরির উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

• পার্বত্য অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ঠান্ডা আরামদায়ক আবহাওয়ার জন্য ভালো পর্যটনক্ষেত্র গড়ে ওঠে। যেমন—দার্জিলিং, উটি, সিমলা।

• বেশিরভাগ বড়ো বড়ো মালভূমিগুলোর প্রায় সবই শুষ্ক জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত। বৃষ্টিপাত কম হওয়ার জন্য বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে ব্যাপকভাবে পশুচারণ করার অনুকূল পরিবেশ পাওয়া যায়।

• বেশিরভাগ মালভূমি অঞ্চল প্রচুর পরিমাণে খনিজসম্পদ সমৃদ্ধ।

• মালভূমি অঞ্চলের রুক্ষ মাটি এবং প্রতিকূল জলবায়ুর কারণে খুব কম পরিমাণে চাষবাস করা যায়।

• পৃথিবীর বেশিরভাগ সমভূমি নদ-নদীর পলি সঞ্চয়ের ফলে সৃষ্টি হওয়ায়, সমভূমি অঞ্চলগুলোই পৃথিবীর সবথেকে উর্বর অঞ্চল।

• একাধিক নদীকেন্দ্রিক সভ্যতা এই সমভূমিগুলোতেই গড়ে উঠেছিল।

• বর্তমানেও বেশিরভাগ শহর, নগর, জনপদ সবই সমভূমি অঞ্চলে অবস্থিত। বিস্তীর্ণ উর্বর সমতলভূমি থাকায়, কৃষি, শিল্প, পরিবহন, ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছুরই সুবিধা পাওয়া যায়। এইজন্য সমভূমি অঞ্চলগুলো পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল অঞ্চল।

খুদে গোয়েন্দারা আগে দেওয়া তথ্যগুলো আসলে এক একটা সূত্র। প্রথমে খুব বিচক্ষণভাবে পড়ে বুঝে নাও। তারপর বিশ্লেষণ করে অনুমান করতে হবে কোথায়, কী হতে পারে আর কোনটা হতে পারে না। এরপর সঠিক বক্সগুলোতে '√' চিহ্ন দিয়ে দাও!

জনজীবনে ভূমিরূপের প্রভাব

মগজাস্ত্র!

মানুষের জীবন	পার্বত্য অঞ্চলে	মালভূমি অঞ্চলে	সমভূমি অঞ্চলে
প্রধান জীবিকা কী কী হতে পারে?	কৃষিকাজ □ ব্যবসা □ পরিবহন □ পশুপালন □ পর্যটন শিল্প □ ভারী শিল্প □ কাঠ শিল্প □ খনিজ উত্তোলন □ বিনোদন শিল্প □	কৃষিকাজ □ পশুপালন □ ব্যবসা □ শিল্প □ খনিজ উত্তোলন □ ভারী শিল্প □ কাঠ শিল্প □ পর্যটন, বিনোদন শিল্প □ পরিবহন শিল্প □	কৃষিকাজ □ শিল্প □ ব্যবসা □ পশুপালন □ পরিবহন □ খনিজ উত্তোলন □ পর্যটন, বিনোদনশিল্প □
যাতায়াত ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত?	খুব ভালো □ ভালো □ ভালো নয় □	খুব ভালো □ ভালো □ মাঝারি □ ভালো নয় □	খুব ভালো □ ভালো মাঝারি □ ভালো নয়
□ জনবসতি ও জনঘনত্ব কেমন হতে পারে?	খুব বেশি □ বেশি □ মাঝারি □ কম □	খুব বেশি □ বেশি □ মাঝারি □ কম □	খুব বেশি □ বেশি □ মাঝারি □ কম □
অর্থনৈতিক উন্নতি কেমন হতে পারে?	বেশি □ মাঝারি □ কম □	বেশি □ মাঝারি □ কম □	বেশি □ মাঝারি □ কম □
জীবনযাত্রা	কষ্টকর □ সহজ □	কষ্টকর □ সহজ □	কষ্টকর □ সহজ □

☞ এবার তোমার নিজের অঞ্চলের একটা সমীক্ষা করে ফেলো।

১. তোমার অঞ্চলটার ভূ-প্রকৃতি— সমতল □ ঢেউ খেলানো □ খুবই উঁচু নিচু □

২. ভূমির ঢাল কেমন—ঢাল প্রায় নেই □ মাঝারি ঢাল □ খাড়া ঢাল □

৩. কাছাকাছি কোনো পাহাড় বা পর্বত আছে?— হ্যাঁ □ না □

৪. কাছাকাছি কোনো ছোটো বা বড়ো নদী আছে?— হ্যাঁ □ না □
নদীর নাম..................

৫. কাছাকাছি কোনো ঝরনা, জলাধার, বাঁধ আছে?— হ্যাঁ □ না □
নাম...

৬. আশেপাশে কোনো বড়ো বনভূমি বা জঙ্গল আছে?— হ্যাঁ □ না □
নাম...

৭. অঞ্চলটাকে কী মনে হয়?— পার্বত্য অঞ্চল □ মালভূমি অঞ্চল □ সমভূমি অঞ্চল □

৮. মানুষের প্রধান জীবিকা কী?

....

৯. কাছাকাছি কোনো বড়ো পাকা রাস্তা, রেললাইন আছে?

....

১০. পাকা রাস্তা বা রেললাইন থেকে তোমার বাড়িটা কতটা দূরে—

....

১১. কাছাকাছি কোনো স্কুল, হাসপাতাল, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, রেলস্টেশন থাকলে তা তোমার বাড়ি থেকে কতটা দূরে আছে?

....

১২. তোমার বাড়ি এবং আশেপাশের বাড়িগুলো— পাকা ☐ কাঁচা ☐

১৩. বাড়িগুলো ঘনঘন ☐ ফাঁকা-ফাঁকা ☐

১৪. জায়গাটা গ্রাম ☐ শহর ☐ মফস্‌সল ☐।

মজার খেলা—শব্দ সন্ধান

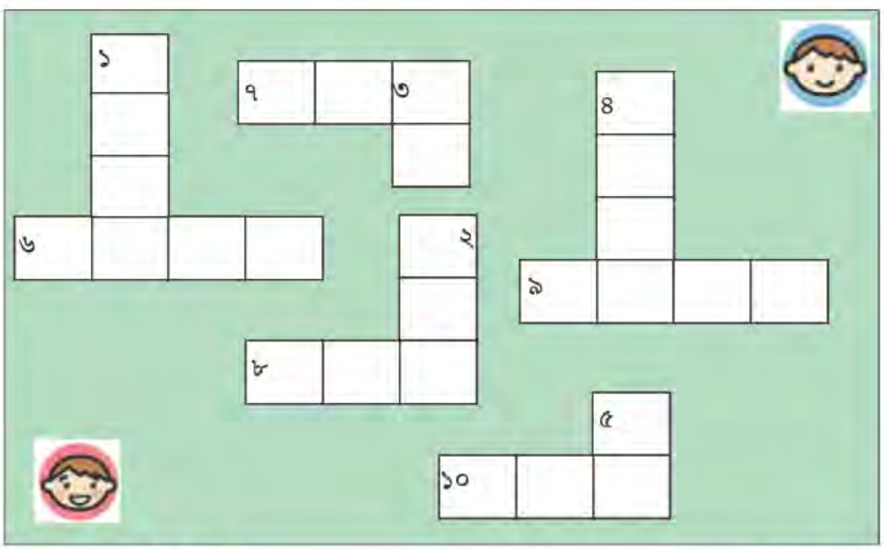

উপর-নীচ

১. জাপানের একটা আগ্নেয় পর্বত।

২. দক্ষিণ আমেরিকার সমভূমি।

৩. আমেরিকার ভঙ্গিল পর্বত।

৪. ভারতের একটা স্তূপ পর্বত।

৫. ফ্রান্সের একটা স্তূপ পর্বত।

পাশাপাশি

৬. এশিয়ার ভঙ্গিল পর্বত।

৭. 'পৃথিবীর ছাদ'।

৮. ইউরোপের ভঙ্গিল পর্বত।

৯. ভারতের প্রাচীন ভঙ্গিল পর্বত।

১০. দক্ষিণ আমেরিকার ভঙ্গিল পর্বত।

নদী

পাহাড়ের মাথায় একটা বড়ো পাথরের ওপর বসে আছে 'হৈ'। চারদিকে ঘন সবুজ পাইনের বন... নীচের উপত্যকার দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছে সে।

হঠাৎ লাফাতে লাফাতে 'চৈ' এসে বলল—'ওহে ভাবুক, কী এত দেখছো?' —দূরে ঐ উপত্যকা দিয়ে বয়ে চলা নদীটাকে।— নদী? ওখানে অত বড়ো নদী এল কোথা থেকে? —'হৈ' বলল- এই পাহাড় থেকে যে ছোটো জলধারাটা বয়ে চলেছে, সেটা ওই নদীতে গিয়ে মিশেছে।...... সব নদীই এরকম ছোটো জলধারা থেকে শুরু হয়। ধীরে ধীরে অনেকগুলো জলধারা একসঙ্গে মিশে একটা বড়ো জলধারা বা 'নদী' তৈরি হয়।

—'চৈ'-এর ঠিক বিশ্বাস হলো না, সে আরও অস্থির হয়ে বলল—'আমি দেখব কোথায় জলধারা গুলো মেশে---কী ভাবে নদী তৈরি হয়'।

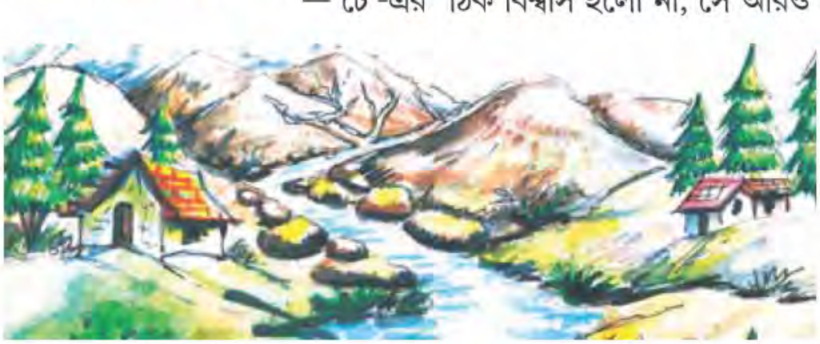

তারপর মহা উৎসাহে 'হৈ' আর 'চৈ' ঐ জলধারার ধার ধরে পাহাড় বেয়ে নীচের দিকে নামতে লাগলো, এভাবে চলতে চলতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো—একজায়গায় জলের তীব্র আওয়াজে থামল 'চৈ'। দেখল-আরেকটা জলধারা এসে পড়েছে তাদের জলধারাটায়।

এরকম অনেকগুলো জলধারা পেরিয়ে প্রায় সন্ধের মুখে একটা সমতল জায়গায় এসে থামল তারা, বুঝল—এটাই পাহাড়ের নীচের সেই উপত্যকাটা! কিছু দূরেই জলের বিরাট গর্জন শোনা যাচ্ছে— আশপাশের পাহাড় থেকে অনেকগুলো জলধারা এসে তৈরি করেছে বিরাট এক জলধারা!

—'নদী!নদী!'—উল্লাসে চিৎকার করে উঠল 'চৈ'।

প্রবলবেগে সেই নদী বয়ে চলেছে উপত্যকার মধ্যে দিয়ে আরও নিচু অঞ্চলের দিকে।—হয়তো কোনো সমুদ্রের দিকে-----

গল্পটা নদীর সৃষ্টির গল্প। সহজে বললে—পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন দিক থেকে প্রবাহিত ছোটো ছোটো জলধারাগুলো যখন পরস্পর মিলিত হয়ে ভূমির ঢাল অনুসারে উঁচু থেকে নিচু স্থানের দিকে বয়ে চলে, তখন নদীর সৃষ্টি হয়।

- নদী যেখানে সৃষ্টি হয়, সেই জায়গাকে নদীর **উৎস (Source)** বলে। সাধারণত পাহাড়-পর্বত বা মালভূমির মতো কোনো উঁচু জায়গায় নদীর উৎপত্তি বা সৃষ্টি হয়। গঙ্গোত্রী হিমবাহের 'গোমুখ' থেকে ভারতের প্রধান নদী গঙ্গার উৎপত্তি হয়েছে।

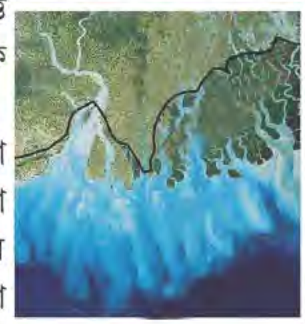

- যেখানে গিয়ে নদী শেষ হয়, অর্থাৎ নদী কোনো সাগর-উপসাগর, হ্রদ, জলাশয় বা অন্য কোনো নদীতে গিয়ে মেশে, সেই জায়গাকে নদীর **মোহনা(Confluence)** বলে। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে গঙ্গা নদীর মোহনা।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান নদী

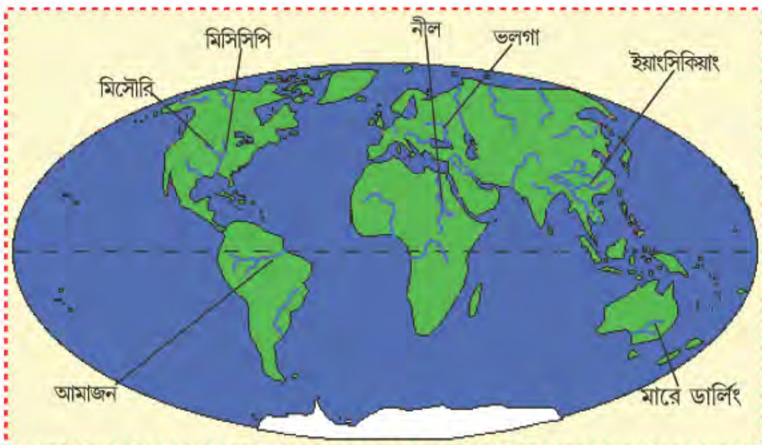

নদী হলো স্বাভাবিক প্রবহমান জলধারা, যা অভিকর্ষের টানে, ভূমির ঢাল অনুসারে উৎস থেকে মোহনার দিকে বয়ে চলে।

নদীগুলো কতটা লম্বা? এঁকে ফেলতে পারো!!

বড়ো সংখ্যাকে ছোটো করে নিলে আঁকতে সুবিধা হবে। প্রথমে সব দৈর্ঘ্যগুলো এক হাজার দিয়ে ভাগ করে ফেলো। তারপর ভাগফলগুলোকে সেমি. ধরে, একটা স্কেলের সেন্টিমিটারের দাগ অনুযায়ী লম্বা করে লাইন এঁকে ফেলো। প্রতিটা নদীর জন্য একটা করে লাইন টানতে হবে। যেমন ৬৩০০ কিলোমিটারকে ১০০০ দিয়ে ভাগ করলে হয় ৬.৩ । একে সেন্টিমিটার ধরে নিয়ে খাতায় একটা ৬.৩ সেন্টিমিটার লম্বা লাইন এঁকে ফেলো। প্রতিটা নদীর জন্য টানা লাইনগুলোর পাশে নদীর নামগুলো লিখে ফেলো। দেখোতো কোন নদী কত লম্বা তা এক নজরেই বোঝা গেলো কিনা!

পৃথিবীর প্রধান নদীগুলোর নাম (দৈর্ঘ্য অনুসারে)	কোন মহাদেশে অবস্থিত	দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১. নীল	আফ্রিকা	৬,৬৫০
২. আমাজন	দ:আমেরিকা	৬,৩০০
৩. ইয়াংসিকিয়াং	এশিয়া	৫,৫৩০
৪. মিসিসিপি	উ:আমেরিকা	৪,০৯০
৫. মিসৌরি	উ:আমেরিকা	৩,৭৭০
৬. মারে ডার্লিং	ওশিয়ানিয়া	৩,৭২০
৭. ভলগা	ইউরোপ	৩,৭০০

শব্দগুলো 'কঠিন' ! সহজ করে বুঝে নাও

● **ধারণ অববাহিকা (Catchment Basin)** তোমরা 'হৈ' আর 'চৈ'-এর যে গল্পটা পড়লে, ওটা আসলে নদীর 'ধারণ অববাহিকারই' গল্প। উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলের বরফগলা জল বা বৃষ্টির জল অসংখ্য ছোটো ছোটো জলধারার মাধ্যমে বয়ে গিয়ে পর্বতের পাদদেশে এসে নদী তৈরি করে। পর্বতের উপর থেকে পাদদেশ পর্যন্ত যে বিরাট অংশের জল মূল নদীতে এসে পড়ে, সেই অঞ্চলটাই হলো ওই নদীর **ধারণ অববাহিকা**।

● **জলবিভাজিকা (Watershed)** তোমার ভূগোল বইটার মাঝের পাতাটা খোলো, তারপর খোলা অবস্থায় বইটা উল্টে দাও। ভেবে দেখো, যদি মাঝখানের উঁচু শিরার মতো অংশটায় জল পড়ে, তাহলে কী হবে?

জলটা উঁচু অংশটা থেকে দুদিকে ঢাল বরাবর গড়িয়ে যাবে, তাই তো?

ঠিক এইভাবে উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলে যখন বৃষ্টি হয়, সেই বৃষ্টির জল ভূমির ঢাল বরাবর বিভিন্নদিকে বয়ে যায়। অর্থাৎ কোনো পাহাড়ের চূড়ার অংশটা বৃষ্টির জলকে বিভিন্ন দিকে ভাগ করে বা 'বিভাজন' করে, তাই তাকে '**জলবিভাজিকা** বলে। জলবিভাজিকার বিভিন্ন দিকে বয়ে যাওয়া জল, একাধিক ছোটো ছোটো জলধারার মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়ে, মিলিত হয়ে মূল নদী তৈরি করে।

'হৈ-চৈ'-এর গল্পে নিশ্চয়ই লক্ষ করেছো অনেকগুলো ছোটো ছোটো জলধারা পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়ে একটা বড়ো নদী তৈরি করেছে। ঐ ছোটো ছোটো জলধারাগুলো মূল নদীটার **উপনদী**।

দেখো কী হয় !

বাড়ির উঠোনে, পার্কে বা স্কুলের মাঠে, ঢালু জায়গায় জল ঢেলে দিয়ে দেখো, ভূমির ঢাল কোন দিকে । জল উঁচু থেকে নীচের দিকে গড়িয়ে যাবে,ঢালের উপরের দিকে এবার পাশাপাশি (৬ ইঞ্চি ব্যবধানে) কিন্তু একটু উপরে-নীচে তিনটি বিন্দু 'ক', 'খ', 'গ' চিহ্নিত করো। এরপর তিনটি বিন্দুতে জল ঢেলে দিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখো তিনটে জলধারা ঠিক কীভাবে উঁচু থেকে নিচুর দিকে গড়িয়ে যায়।

আরও একটা বিন্দু 'ঘ' নাও। 'ঘ' এর সামনে একফুট দূরে একটা বড়ো ইট বা বড়ো পাথর রেখে দাও, এবার 'ঘ' বিন্দুতে জল ঢেলে দেখো জলধারাটা কীভাবে গড়িয়ে যায়।

● উৎস থেকে সৃষ্টি হয়ে কোনো নদী যখন অন্য কোনও নদীতে এসে মেশে, তখন তাকে ঐ নদীটার **উপনদী (Tributary)** বলে। যমুনা, গোমতী,ঘর্ঘরা, কোশী, গণ্ডক প্রভৃতি নদীগুলো গঙ্গার উপনদী।

● আবার মূলনদী থেকে যে সমস্ত নদী শাখার মতো বেরিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে মেশে তাদেরকে **শাখানদী (Distributary)** বলে। ভাগীরথী-হুগলী হলো গঙ্গার প্রধান শাখানদী।

ভেবে দেখোতো !

আগের দুটো পরীক্ষায় জলের প্রবাহ লক্ষ করে, যা কিছু বুঝতে পারলে তার সঙ্গে এই 'উপনদী' ও 'শাখানদীর' ধারনার কি কোনো মিল পেলে?

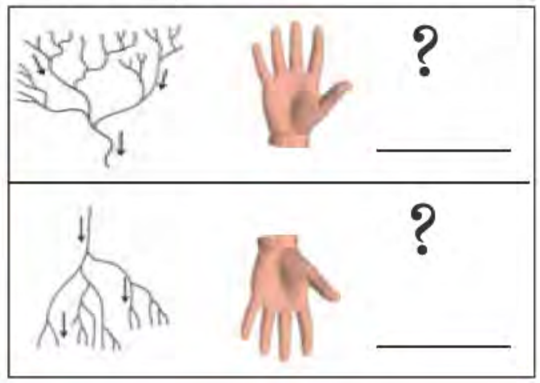

পিকলুর ডায়েরি

● 'উৎস' থেকে 'মোহনা' পর্যন্ত যে খাতের মধ্যে দিয়ে নদী প্রবাহিত হয় তাকে **নদীর উপত্যকা (River Valley)** বলে।

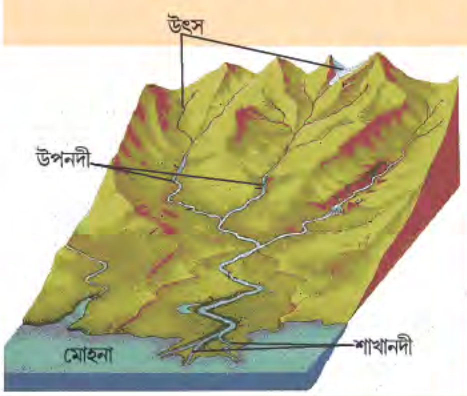

● নদী তার উপনদী ও শাখানদী সহ উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত যে অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়, সেই বিস্তীর্ণ ভূমিভাগকে **নদী অববাহিকা(River Basin)** বলে। আমাজন নদীর অববাহিকা পৃথিবীর বৃহত্তম নদী অববাহিকা।

● পাশাপাশি প্রবাহিত দুটো নদীর মধ্যবর্তী স্থানকে **দোয়াব** বলা হয়। (পার্শি শব্দ 'দোয়াব' 'দো'= দুই 'আব'=জল/নদী) ভারতের গঙ্গা ও যমুনা নদীর 'দোয়াব' অংশে আগ্রা, এলাহাবাদ প্রভৃতি শহর অবস্থিত।

● যে নদী কোনো দেশের মধ্যে উৎপন্ন হয়ে সেই দেশের মধ্যেই কোনো হ্রদ বা জলাশয়ে গিয়ে মেশে তাকে **অন্তর্বাহিনী নদী (Inland River)** বলে। ভারতের লুনি, রাশিয়ার আমুদরিয়া অন্তর্বাহিনী নদী।

● যে নদী একাধিক দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তাকে **আন্তর্জাতিক নদী (International River)** বলে। সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, ইউরোপের রাইন, দানিয়ুব আন্তর্জাতিক নদী।

● পুজোর ছুটিতে গঙ্গোত্রী বেড়াতে গিয়ে পুতুল যখন জানতে পারলো যে ডায়মন্ডহারবারে তার বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া শান্তশিষ্ট গঙ্গা নদীটাই এখানে ভীষণ জোরে শব্দ করে ছুটে চলেছে, তখন তার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

● আরও একটা ব্যাপার সে লক্ষ করল, গঙ্গোত্রীতে নদীটা খুব বেশি চওড়া নয়, বেশি জলও নেই, অথচ প্রবল তার গতি! কিন্তু তার বাড়ির কাছে এই নদীটাই কত চওড়া আর প্রচুর জলে ভর্তি!

বলতে পারো, একই নদী দুটো জায়গায় দুরকম কেন?

পুতুলের মতো তোমরাও নিশ্চয়ই তোমার বাড়ির আশপাশের কোনো নদীকে লক্ষ করেছো?

● **ভেবে দেখেছো নদীর 'এত' জল আসছে কোথা থেকে?** (বরফ-গলা জল/বৃষ্টির জল/ ঝরনার জল/ হ্রদের জল/না কি অন্য কোনো নদী থেকে?)

*'আমাদের ছোটো নদী চলে বাঁকে বাঁকে
বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে---'*

● তোমার দেখা কোনো নদীর সঙ্গে যদি এই কবিতার মিল খুঁজে পাও, তাহলে সেই নদীটার নাম লেখো —————————————।

জানো কী?

● সাধারণত যে সব নদী উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে সৃষ্টি হয়, তার জলের উৎস প্রায়শই বরফ-গলা জল। এই নদীগুলোতে সারা বছর জল থাকে বলে এদের **নিত্যবহ নদী (Perennial river)** বলে। মানচিত্রে এই নদীগুলো নীলরঙের সাহায্যে দেখানো হয়।

● মালভূমি বা অন্য কোনো কম উঁচু জায়গায় সৃষ্টি হওয়া নদীগুলোর জলের উৎস সাধারণত বৃষ্টির জল। একারণে শুধুমাত্র বর্ষাকাল ছাড়া, সারাবছর এই নদীগুলোতে জল প্রায় থাকে না, তাই এদেরকে **অনিত্যবহ নদী (Non-perennial river)** বলে। মানচিত্রে এই রকম নদীকে কালো রঙে দেখানো হয়।

বর্ষাকালে অথবা কোনো বৃষ্টির দিনে রাস্তার জমা জলে, নর্দমার জলে, খালে, বিলে কাগজের নৌকা ভাসাতে বেশ ভালো লাগে, কেমন তর্ তর্ করে স্রোতে ভেসে চলে! — লক্ষ করেছো কি জলটা কেমন ঘোলা। জলের স্রোতে মাটি, বালি, ছোটো নুড়ি পাথর, আর্বজনা সবই জলের মধ্যে এসে পড়ে, আবার কিছুদূরে যেতে না যেতেই নৌকাটাও কোথাও আটকে যায়!

নদী কী কী কাজ করে

● নদীও মূলত বয়ে যাওয়া জলধারা। নদীও তার জলস্রোতের ধাক্কায় মাটি, বালি, ছোটো বড়ো নুড়ি এমনকি বড়ো বড়ো পাথর সবই চূর্ণ করে এগিয়ে চলে, এটাই নদীর **ক্ষয়কাজ (Erosion)**।

● এইসব নুড়ি, কাঁকড়, বালি, পলি সবই নদীর স্রোতের সঙ্গে উঁচু থেকে নিচু অঞ্চলের দিকে বয়ে চলে, এটাই নদীর **বহনকাজ (Transportation)**।

● আবার কোথাও স্রোত কমে গেলে এই সব পদার্থগুলো নদীর পাশে বা নদীর মধ্যে জমা হতে থাকে। এটাই নদীর **সঞ্চয়কাজ (Deposition)**।

নদীর এই তিনপ্রকার কাজ নির্ভর করে নদীর শক্তির ওপর। নদীতে জলের পরিমাণ, গতিবেগ, ভূমির ঢাল প্রভৃতি থেকে নদী শক্তি পায়। নদীর শক্তি বেড়ে গেলে, নদী বেশি করে ক্ষয় আর বহন কাজ করে, আবার নদীর শক্তি কমে গেলে নদী বেশি সঞ্চয় করে।

নদীর শক্তির সঙ্গে নদীর কাজের কী সম্পর্ক, বুঝতে পারলে ?

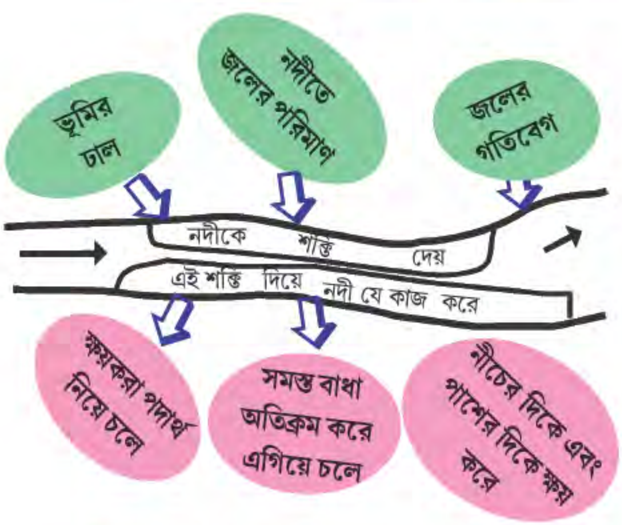

ভেবে দেখেছো ?

স্কুল থেকে ফেরার পর কেমন ক্লান্ত লাগে। যে স্কুলব্যাগটা স্কুলে যাওয়ার সময় অনায়াসে বয়ে নিয়ে গেছ, সারাদিন পর ফিরে সেটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রেখে দিতে ইচ্ছে করে। আবার খাওয়া দাওয়া করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলে আর ক্লান্তি থাকে না। তুমিও শক্তি পেয়ে যাও!

পরীক্ষা করে বলো তো ?

জল কোথায় তাড়াতাড়ি গড়িয়ে যায়?

- সমতল জায়গায় ☐
- ঢালু জায়গায় ☐

ঢালু জায়গায় জল কখন তাড়াতাড়ি গড়িয়ে যায়?

- জলের পরিমাণ বাড়লে ☐
- জলের পরিমাণ কমলে ☐

মানুষের জীবনের সঙ্গে নদীর কী মিল!!

ভেবে দেখেছ, মানুষের মতো নদীরও একটা জন্ম অর্থাৎ 'উৎস' আছে। আর উৎসের কাছাকাছি প্রচণ্ড শক্তিতে নদী দুরন্ত গতিতে বয়ে চলে, নদী তখন ঠিক তোমাদেরই মতো ছট্‌ফটে, চঞ্চল!

⇨ এটাই নদীর উচ্চপ্রবাহ।

পরবর্তী পর্যায়ে নদী যখন পাহাড় থেকে মালভূমি বা সমভূমিতে এসে পড়ে, তখন ভূমির ঢাল কম হয়ে যাওয়ায় নদীর শক্তিও কমে যায়, আর নদীর গতিও কম হতে শুরু করে। নদী তখন একজন পরিণত মানুষের মতোই (যেমন বাড়িতে তোমার মা-বাবা) ধীর এবং শান্ত।

⇨ এটাই নদীর মধ্যপ্রবাহ।

শেষ পর্যায়ে নদী যখন সাগর বা অন্য কোনো জলভাগের কাছাকাছি চলে আসে, তখন ভূমির ঢাল একেবারেই থাকে না, নদীর শক্তিও প্রায় ফুরিয়ে যায়, নদী তখন বৃদ্ধ মানুষের মতোই (যেমন তোমার ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমা বা দাদু, দিদা) কাজ করার ক্ষমতা প্রায় থাকে না এবং শেষ পর্যন্ত 'মোহনায়' গিয়ে তার প্রবাহ শেষ হয়ে যায়।

⇨ এটাই নদীর নিম্নপ্রবাহ।

- উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত প্রবাহপথে নদী তার শক্তি অনুযায়ী ক্ষয়, ক্ষয়জাত পদার্থ বহন এবং বাহিত পদার্থ সঞ্চয়ের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠকে প্রতিনিয়তই পরিবর্তন করে চলেছে।

নদীর উচ্চপ্রবাহ

উৎস থেকে সমতলভূমিতে নামার আগে পর্যন্ত নদীর **উচ্চপ্রবাহ**।

ভারতের প্রধান নদী গঙ্গার উচ্চপ্রবাহ গোমুখ থেকে হরিদ্বার পর্যন্ত।

নদী, জলচক্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বৃষ্টির জল নদীর মধ্য দিয়ে সাগরে গিয়ে পড়ে। সাগরের জল বাষ্পীভূত হয়ে বৃষ্টিরূপে আবার নদীতে ফিরে আসে।

- পার্বত্য অঞ্চলে ভূমির ঢাল এবং ভূমির উঁচু নিচুভাব (বন্ধুরতা) খুব বেশি হওয়ার জন্য নদীর শক্তিও বেশি থাকে। **ফলে এই প্রবাহে নদীর প্রধান কাজ ক্ষয়।**

- এই প্রবল জলস্রোতের আঘাতে নদীর গতিপথের বড়ো বড়ো পাথর ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে জলের সঙ্গে ভেসে বা গড়িয়ে এগিয়ে চলে।

- নদীর স্রোতের সঙ্গে এই ছোটোবড়ো পাথরগুলো নদীর তলায় ধাক্কা দিয়ে ক্ষয় করে, ফলে নদীর উপত্যকা গভীর হতে থাকে। উচ্চ প্রবাহে নদীর উপনদীর সংখ্যা কম থাকে, ফলে নদী-উপত্যকা খুব চওড়াও হয় না। এই 'সরু' এবং 'গভীর' নদী উপত্যকা ইংরেজি **'I'** বা **'V'** অক্ষরের মতো দেখতে হয়। একে **গিরিখাত (Gorge)** বলে। বৃষ্টিহীন পার্বত্য অঞ্চলে, শুষ্ক অঞ্চলে এরকম সুগভীর গিরিখাতকে **ক্যানিয়ন (Cannyon)** বলা হয়।

- নদীর গতিপথে শক্ত আর নরম পাথর অনুভূমিক ভাবে থাকলে, নদী নরম পাথরকে বেশি ক্ষয় করে, ফলে শক্ত এবং নরম পাথরের মধ্যে ধাপের সৃষ্টি হয় আর নদী শক্ত পাথরের ওপর থেকে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে, **জলপ্রপাত (Waterfall)** সৃষ্টি করে। পশ্চিমঘাট পর্বতের 'যোগ' জলপ্রপাত (২৬০ মিটার)।

নদীর মধ্যপ্রবাহ

পার্বত্য অঞ্চলের পর, মালভূমি বা সমভূমি অঞ্চলে নদীর **মধ্যপ্রবাহ**।

হরিদ্বার থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের মিঠিপুর পর্যন্ত গঙ্গানদীর মধ্যপ্রবাহ।

- মধ্যপ্রবাহে ভূমির ঢাল কম থাকায় নদীর গতি এবং শক্তি দুটোই কমে যায়। **নদী প্রধানত বহন এবং সঞ্চয় কাজ করে।**

- এসময় নদী নীচের দিকে ক্ষয় করা প্রায় বন্ধ করে দেয়, ফলে উপত্যকার গভীরতাও কমে যায়। প্রচুর উপনদীর মাধ্যমে নদীতে জলের পরিমাণ বাড়ে এবং নদী দুপাশের দিকে বেশি ক্ষয় করে, ফলে নদী উপত্যকা চওড়া হতে থাকে।

- ভূমির ঢাল কমে যাওয়া এবং জলের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার কারণে নদী খুবই আঁকাবাঁকা পথে **(মিয়েন্ডার)** প্রবাহিত হয়। নদীর বহনক্ষমতাও কমে যায়। বয়ে আনা পলি বালি, নুড়ি, কাঁকর নদীর মধ্যে বা দুধারে সঞ্চিত হলে, জল প্রবাহের পথ আটকে যায়। নদীতে চড়া পড়ে। কখনও **নদী- দ্বীপ** তৈরি হয়।

- পৃথিবীর মোট স্থলভাগের ৬০ শতাংশ স্থানে কম বেশি নদীর কাজ দেখা যায়।
- সব নদীতে ‘উচ্চ’, ‘মধ্য’ এবং ‘নিম্ন’ এই তিনটি প্রবাহ দেখা যায় না।

- নদীর বাঁকের একদিকে (খাড়াপাড়ের দিকে) জলস্রোত বেশি থাকে, তার উল্টোদিকে (ঢালুপাড়ে) সঞ্চয় বেশি হয় ফলে নদী একপাড় ভাঙে, অন্য পাড় গড়ে। নদীর বাঁকের পরিমাণ বাড়লে, বা নদীতে জল বাড়লে কখনো কখনো নদী বাঁকের একটা অংশ মূল নদী থেকে আলাদা হয়ে যায়। এই আলাদা হওয়া অংশটা ঘোড়ার খুরের মতো দেখতে হয় বলে একে **অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ** বলে।

উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত নদীর গতিপথ

উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত নদীর প্রধান কাজ

উচ্চ প্রবাহ
নদী তীব্র গতিতে বয়ে চলে।
প্রবল ভাবে ক্ষয় কাজ করে।

মধ্য প্রবাহ
নদীতে জলের পরিমাণ বাড়ে।
কিছুটা ক্ষয়, কিছুটা বহন করে।

নিম্ন প্রবাহ
নদীর গতি কমে যায়।
কিছুটা বহন, প্রধানত সঞ্চয় কাজ।

নদীর নিম্ন প্রবাহ

● উচ্চ এবং মধ্যপ্রবাহের পর অত্যন্ত মৃদু ভূমিঢালের ওপর দিয়ে এঁকে বেঁকে নদী মোহনা পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। এটাই **নিম্নপ্রবাহ**। মুর্শিদাবাদের মিঠিপুরের পর থেকে বঙ্গোপসাগরে মোহনা পর্যন্ত গঙ্গা নদীর নিম্নপ্রবাহ।

এই সময় নদীর গতি এবং শক্তি এতই কমে যায় যে ক্ষয়কাজ একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়, সামান্য বহন কাজ হলেও, **নদীর মূল কাজ হয় সঞ্চয়।**

এই প্রবাহে উপনদী প্রায় থাকেই না। বরং কিছু শাখানদী সৃষ্টি হয়। নদীর মধ্যে পলি, বালি, কাঁকর জমে নদী অগভীর হয়ে যায়। ফলে বর্ষার অতিরিক্ত জল দুকূল ছাপিয়ে বন্যা সৃষ্টি করে। নদীর দুধারের বিস্তীর্ণ জমিতে বন্যার সময় পলি সঞ্চিত হয়ে উর্বর **প্লাবনভূমি (Flood plain)** সৃষ্টি করে।

খাঁড়ি কী?

- কিছু নদীর মোহনায় জোয়ারের সময় নোনা জল নদীতে ঢুকে ফানেলের মতো আকৃতির চওড়া মোহনা বা খাঁড়ি তৈরি করে।
- পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলের প্রচুর নদীতে এরকম খাঁড়ি দেখা যায়।

➤➤ নদীর মোহনার কাছে নদীর বহন করে আনা পলি, বালি, কাঁকর জমা হয়ে চড়া সৃষ্টি হয়। নদীর স্রোত তখন ভাগ হয়ে চড়ার দুদিক দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। ফলে প্রায় ত্রিভুজের মতো (বাংলার মাত্রাহীন '△' / গ্রিক অক্ষর 'ডেল্টা'র মতো) **ব-দ্বীপ (Delta)** সৃষ্টি হয়।

● সব নদীই কিন্তু মোহনায় ব-দ্বীপ সৃষ্টি করতে পারে না। নদীতে পলির পরিমাণ কম থাকলে, নদী প্রবল বেগে সমুদ্রে পড়লে, অথবা মোহনায় প্রবল সমুদ্র স্রোত থাকলে ব-দ্বীপ গড়ে উঠতে পারে না। একারণেই পৃথিবীর বৃহত্তম নদী আমাজনের কোনো ব-দ্বীপ নেই।

ঠিক ঠিক লেখো দেখি

উচ্চগতি	⇨ মধ্যগতি	⇨ নিম্নগতি
↓	↓	↓
ক্ষয়কাজ বেশি	? / কম	ক্ষয়কাজ হয় না
↓	↓	↓
? / কম	বহনকাজ বেশি	? / বেশি হয়

ধরতে পারলে মজা

⇨ তোমার বাড়ির কাছাকাছি কোনো নদীকে লক্ষ করে নদীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধরণা করো।

⇨ নদীটার নাম——

⇨ নদীতে জল (বেশি / কম)

⇨ নদীর গতিবেগ (বেশি / কম)

⇨ ভূমির ঢাল (বেশি / কম)

⇨ **অতএব নদীটার কোন প্রবাহ? (উচ্চ/মধ্য/নিম্ন)।**

নদী ও মানুষ

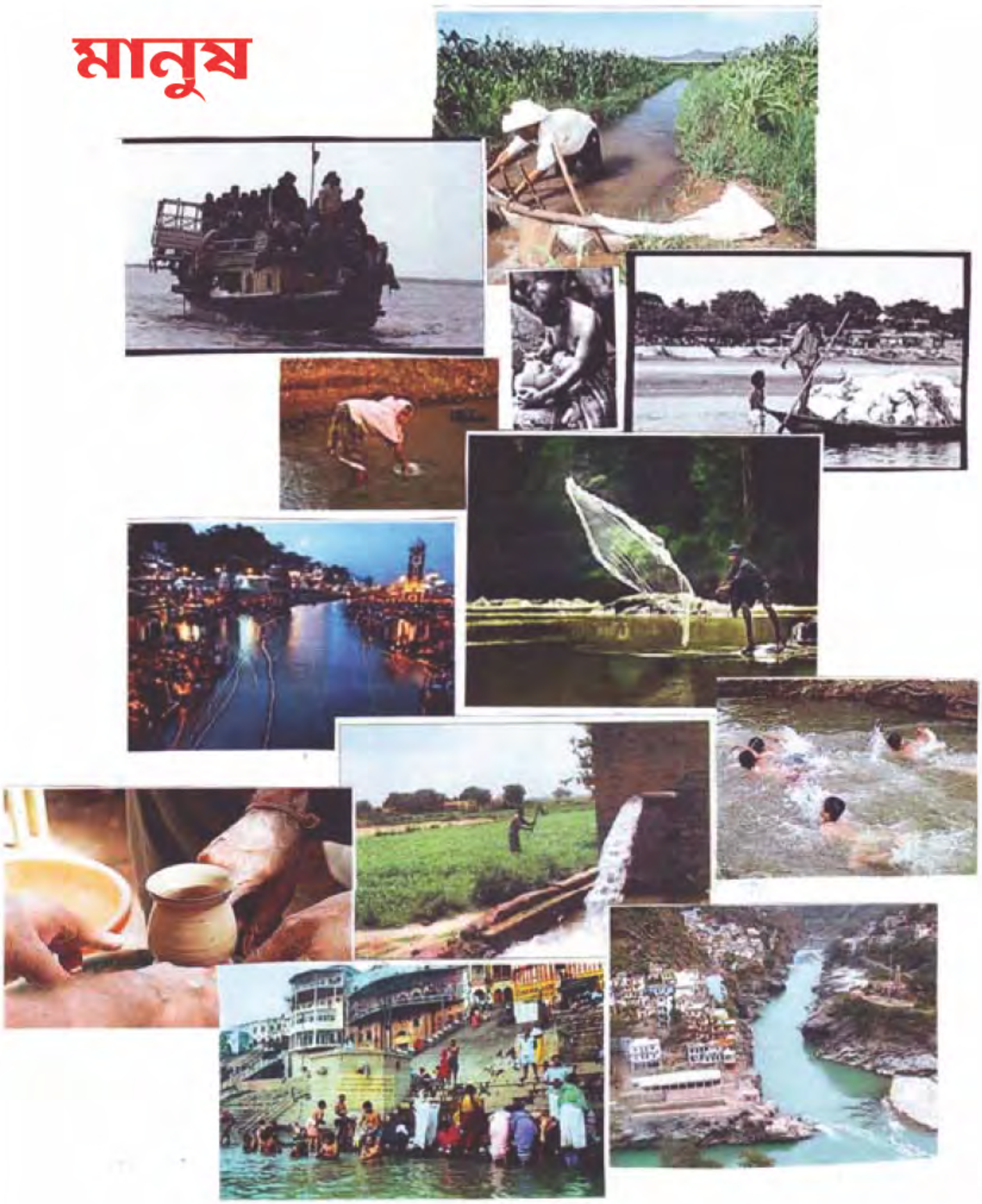

আমাদের জীবনে নদীর প্রভাব কতখানি

সেদিন ভূগোল ক্লাসে শিক্ষক মহাশয় যখন মধুকে নদীর উপকারিতা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন , মধু শুধু একটা কথাই বলেছিল— **'নদীটা আমাদের খেতে দেয়, আমাদের বাঁচিয়ে রাখে!'**

নদীমাতৃক এই দেশের নদীগুলো আসলে আমাদেরই **জীবনকথা**। নদী শুধু আমাদের ভূগোল, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, ভূতত্ত্বের বিষয় নয়। রোজকার জীবনের সঙ্গে নানা ভাবে জড়িয়ে আছে নদী।

➤ মানুষের প্রাচীনতম সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছিল কোনো না কোনো নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে। (সিন্ধু নদের তীরে সিন্ধু সভ্যতা, নীল নদের তীরে মিশরীয় সভ্যতা, টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর ধারে সুমেরীয় সভ্যতা)। বর্তমানকালে আমাদের গঙ্গা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্রের যে সুবিশাল সমভূমি, চিনের ইয়াং সিকিয়াং, হোয়াংহো নদীর উপত্যকা সবই পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল অঞ্চল। অতএব নদী শুধু সভ্যতার জন্মই দেয় না, তাকে লালন-ও করে।

ছবির কোলাজ থেকে সব লিখে ফেলা যায়

নদীর প্রভাব	আমাদের জীবনে
নদীর জল	
পলিমাটি, সমভূমি	কৃষিকাজ, নগরায়ন, সভ্যতার উন্নতি
প্লাবনভূমি, কৃষিজমি	
জলসেচ	
জলবিদ্যুৎ	
নদীর মাছ, প্রাণী	
পরিবহন	
ভ্রমণ, বিনোদন	
পরিবেশ, বাস্তুতন্ত্র ভারসাম্য	নদীর জল, পলিমাটিতে, উদ্ভিদ, প্রাণীর বিকাশ, মাটির নীচের জলের ভারসাম্য রক্ষা।

ভেবে দেখেছ?

• মানুষের জীবনের সঙ্গে নদীর সম্পর্ক এত নিবিড় হলেও, মানুষের কিছু কিছু কাজ নদীর স্বাভাবিক ছন্দকে নষ্ট করেছে।

➤ কৃষি ব্যবস্থার প্রসার, শিল্পায়ন, নগরায়ন, ইতাদি নানাভাবে নদীকে প্রভাবিত করছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নদীর পাড়ে কৃত্রিম বাঁধ তৈরি করলে সাময়িক সুফল পাওয়া গেলেও শেষ পর্যন্ত তা আরও ভয়াবহ বন্যারই কারণ হয়ে উঠছে! একদিকে কৃষিজমি থেকে ধুয়ে আসা পলিতে নদী ক্রমশ ভরাট হচ্ছে। অন্য দিকে সেচের জলের যোগান দিতে নদী ক্রমশ শুকিয়ে যাচ্ছে।

➤ শহর, শিল্পাঞ্চলের বর্জ্য জল নদীতে অবাধে মিশে গিয়ে নদীর জল ক্রমশ বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে।

ছবিটাকে বুঝতে পারলে ?

শব্দগুলো খুঁজে বের করো

তি	মো	হ	না	দ্ব	ব	হ	ন
প্র	নি	খী	জ	য	ষ	প্র	লু
শা	ত্য	জ	ল	প্র	পা	ত	খা
খা	ব	হ	বি	জ্জ	মা	লী	ত
ন	হ	ক্যা	ভা	শি	স	বি	ষ্ণ
দী	প্ত	নি	জি	ক্ত	ঞ্চ	ঘ	ক
জী	ক্ষ	য়	কা	জ	য়	জি	নি
প্লা	ব	ন	ভূ	মি	জ্র	খা	মি

সূত্র :

- নদী যেখানে মেশে।
- যে নদীতে সারাবছর জল থাকে।
- মূল নদী থেকে যে নদী বেরিয়ে যায়।
- যে ভূখণ্ড বৃষ্টির জলকে বিভিন্ন দিকে ভাগ করে দেয়।
- শুষ্ক অঞ্চলের সুগভীর গিরিখাতকে যা বলে।
- নদীর জল ওপর থেকে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে-----সৃষ্টি করে।
- নদীর দুধারে বন্যার সময় পলি সঞ্চিত হয়ে----সৃষ্টি হয়।
- উচ্চপ্রবাহে, মধ্যপ্রবাহে এবং নিম্ন প্রবাহে নদী যে প্রধান কাজগুলো করে।

শিলা ও মাটি

বিকেল বেলায় জয়দীপ আর রাজর্ষি অমিতদের বাড়ির সামনে নানা মাপের পাথর জড়ো করে রেখে এল। পরের দিন রবিবার। সকালবেলা দু ঘণ্টা একটু পড়াশুনা, তারপর খেলা। পিট্টু খেলা হবে। পাথরগুলো পরপর সাজাতে হবে। **ভেবে দেখেছো পৃথিবীতে এই পাথরগুলো এল কোথা থেকে?**

অনুষ্কা, কোয়েলরা রেল লাইনের পাথর দেখে একদিন অপুদাদাকে জিজ্ঞেস করে ধারালো, সুঁচালো ওই পাথরগুলো কি এভাবেই তৈরি হয়েছে? নাকি এভাবে ভাঙা হয়?

ফিটকিরি

পেনসিলের সিস

খাবার নুন, খাবার সোডা, বিট নুন, পেনসিলের সিস, ফিটকিরি এই জিনিসগুলো আসলে কী?

↓

এগুলো এক একটা খনিজ পদার্থ।

→

এরকম নানা খনিজ দিয়েই শিলা গঠিত।

↑

পিট্টু খেলার পাথর বা রেল লাইনের পাথর আসলে শিলা।

- **পৃথিবীর উপরিভাগের কঠিন আবরণটা শিলা দ্বারা গঠিত। আসলে বিভিন্ন খনিজ পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত একটি যৌগিক পদার্থই হলো শিলা।**

বিভিন্ন ধরনের শিলা

- জন্মের সময় পৃথিবী ছিল একটা আগুনের গোলা। পরে আস্তে আস্তে ঠান্ডা ও শক্ত হয়ে তৈরি হল আগ্নেয় শিলা। গ্রানাইট, ব্যাসল্ট এই ধরনের শিলা। **আগ্নেয় শিলা কঠিন, সহজে ভাঙে না।**

আগ্নেয় শিলা

- বহু বছর ধরে আগ্নেয়শিলা বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপায়ে ক্ষয় হয়ে ছোটো ছোটো নুড়ি কাঁকর, বালিতে পরিণত হয়। পরে এগুলো নদী, বায়ুর দ্বারা বাহিত হয়ে সমুদ্রের নীচে স্তরে স্তরে জমা হয়। বহু বছর পরে শক্ত হয়ে তৈরি করে পাললিক শিলা। বেলেপাথর, কাদাপাথর, চুনাপাথর হলো পাললিক শিলা। পাললিক শিলা নরম, সহজে ভেঙে যায়। বেলেপাথর বা কাদাপাথর দিয়ে ঘরবাড়ি তৈরি হয়। চুনাপাথরও অনেক কাজে লাগে। সিমেন্ট, ইস্পাত কারখানায় চুনাপাথর ব্যবহার করা হয়।

পাললিক শিলা

- আগ্নেয় ও পাললিক শিলা ভূ-গর্ভের তাপে ও ভূ-পৃষ্ঠের চাপে অনেক সময় বদলে গিয়ে রূপান্তরিত শিলায় পরিণত হয়। এই শিলা সহজে ভাঙে না। ক্ষয় প্রতিরোধ করে। বিশ্ববিখ্যাত সৌধ তাজমহল রূপান্তরিত শিলা(মার্বেল) দিয়ে তৈরি।

কাজগুলো সেরে ফেলা যাক...

শিলার উৎপত্তি	কোন শিলা ?
(১) পলির স্তর জমা হয়ে	
(২) লাভা সঞ্চিত হয়ে	
(৩) ভূগর্ভের তাপে ও চাপে	

শিলার বৈশিষ্ট্য	কোন শিলা ?
(১) হালকা ও সহজে ভাঙে	
(২) খুব কঠিন ও ক্ষয় প্রতিরোধকারী	

শিলা থেকে মাটি

নানা প্রাকৃতিক শক্তি যেমন সূর্যের তাপ, বৃষ্টির আঘাত, বাতাসের ধাক্কা বা নদীর স্রোতের দ্বারা শিলা ভাঙে। কখনও টুকরো শিলাগুলো ওইখানেই পড়ে থাকে। কখনও দূরে চলে যায়। আবার বৃষ্টির জলের সাথে, নদীর স্রোতে, বাতাসের সঙ্গেও পাথরগুলো ভাঙতে ভাঙতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়। ক্রমাগত ক্ষয় হয়ে এই ক্ষয়িত পদার্থে স্তরবিন্যাস (রেগোলিথ) হয়। রেগোলিথ থেকে অবশেষে নানা প্রক্রিয়ায় মাটি তৈরি হয়।

মাটিতে কী থাকে?

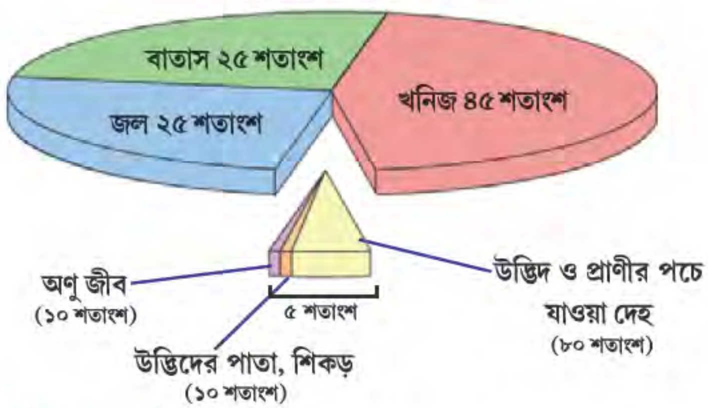

মাটি সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক—

শিলা: ভবিষ্যতে মাটি কেমন হবে তা নির্ভর করে শিলার প্রকৃতির ওপর। তবে জলবায়ু, উদ্ভিদও মাটি তৈরিকে প্রভাবিত করে।

জলবায়ু: জলবায়ু মাটি তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা নেয়। উষ্ণ ও বৃষ্টিবহুল জলবায়ুতে তাড়াতাড়ি মাটি তৈরি হয়। আবার শীতল ও শুষ্ক অঞ্চলে মাটি তৈরি হতে সময় লাগে। তাই উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলে মাটির গভীরতা বেশি হয়।

ভূপ্রকৃতি: ভূমির প্রকৃতি মাটি তৈরিকে প্রভাবিত করে। ভূমির খাড়া ঢালে মাটি তৈরির সুযোগ কম। আবার ভূমির ঢাল যেখানে কম, সেখানে ধীরে ধীরে মাটির স্তর তৈরি হতে পারে।

জীবজগৎ: জীবিত ও মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর অংশ মাটিতে খুব কমই থাকে। কিন্তু, পিঁপড়ে, কেঁচো, ছুঁচো, সাপ মাটিকে আলগা করে। ফলে জল ও বাতাস মাটিতে প্রবেশ করে। মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণী মাটিতে পুষ্টি জোগায়।

সময়: মাটি একদিনে তৈরি হয় না। হাজার হাজার বছর এমনকী লক্ষ লক্ষ বছরও লেগে যায় কখনও কখনও।

মাটির দানা: মাটির দানার মাপ বড় না সূক্ষ্ম তার ওপর ভিত্তি করে মাটির শ্রেণিবিভাগ করা যায়—বেলেমাটির দানা মোটা। দানাগুলোর মধ্যে ফাঁক বেশি। জল ঢাললে মাটি তাড়াতাড়ি টেনে নেয়। কৃষিকাজ ভাল হয় না। এঁটেল বা কাদামাটির দানা সূক্ষ্ম। দানার মধ্যে ফাঁক এতই কম যে, জল ঢাললে জল দাঁড়িয়ে থাকে। ফসল ভাল ফলে। দোঁয়াশ মাটিতে বালি আর কাদা সমান সমান থাকে। জল, বাতাস ও অন্য উপাদান সঠিক মাত্রায় থাকে। সুতরাং, এই মাটি ফসল ফলানোর জন্য বেশ ভাল।

কোন মাটি কী রকম ?

মাটির ধরন	দানার মাপ	জল ধারণের ক্ষমতা	ফসল
এঁটেল			
বেলে			
দোঁয়াশ			

এবার তোমার নিজের অঞ্চলের একটা সমীক্ষা করে ফেলো।

জেলার নাম------------

গ্রাম বা পাড়ার নাম -------

১. তোমার অঞ্চলটার ভূপ্রকৃতি-সমতল/ঢেউ খেলানো/ খুব উঁচুনিচু।
২. আশপাশের কোনো বনভূমি বা জঙ্গল আছে? ---------
৩. জঙ্গল বা বাড়ির আশপাশের কী কী গাছ দেখতে পাও?---------
৪. কোন কোন সবজি চাষ হয়?------------
৫. তোমার এলাকায় ধান বা পাটের ক্ষেত আছে? -------------
৬. গ্রামে বা পাড়ায় কী রকম ঘর বাড়ি আছে? কটা পাকা বাড়ি ---- কটা কাঁচা বাড়ি-----।
৭. কাঁচা বাড়িগুলো কী দিয়ে তৈরি? ---------------
৮. বেশির ভাগ মানুষের জীবিকা বা পেশা কী? ------------------
৯. তোমার অঞ্চলে মাটি দিয়ে বানানো কোন কোন জিনিস তৈরি হয়?------------------
১০. তাহলে তোমার অঞ্চলের মাটি কোন ধরনের বলে তোমার মনে হয়?-------------

পলিমাটির নানারকম ব্যবহার

জলদূষণ

● স্কুলে যাওয়ার পথে জুনি, রেহান, আর সাহানা রাস্তার ধার ধরে হাঁটছিল। রাস্তার একধারে খাল। খালের জলটা কালো, আবর্জনায় ভর্তি আর তা থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে! জুনি বলল— দেখেছিস খালের জলটা পচে গেছে!

● বিট্টুদের পুকুরে এক সময় পরিষ্কার জল টলটল করত। পাড়ার ছেলে মেয়ে বুড়ো সকলেই ঐ পুকুরে স্নান করত, কাপড় কাচত। কিন্তু এখন তা আবর্জনা, শ্যাওলা, কচুরিপানায় ভরে গেছে। মাছ মরে ভেসে উঠছে।

● রফিক মালদায়, তার দাদুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে দেখল—গ্রামের নলকূপের জল কেউ ব্যবহার করছে না। জলে আর্সেনিক আছে। গ্রামে অনেকেরই এই জল খেয়ে হাত-পায়ে কালো পচা ঘা হয়েছে।

● বর্ষাকালে তোমার গ্রামে বা পাড়ায় দূষিত জল ব্যবহার করে কি কেউ কলেরা, আমাশয় আন্ত্রিক, জন্ডিস, টাইফয়েড, পোলিও—এইসব রোগে ভুগেছে?

জলে বিভিন্ন অবাঞ্ছিত রাসায়নিক বা জৈব পদার্থ, জীবাণু মিশে গিয়ে জল মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গেলে এবং জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে গেলে জল দূষিত হয়।

তোমার বাড়ির অ্যাকোরিয়ামের জলে যদি কোনও ভাবে একটু ফিনাইল বা কেরোসিন তেল মিশে যায়, তবে কি মাছগুলো আর বেঁচে থাকবে?

নদীর জলদূষণ

জলদূষণ

সমুদ্রের জলদূষণ

জলাশয়, হ্রদ জলদূষণ

ভূগর্ভের জলদূষণ

পিকলুর ডায়েরি

নদীমাতৃক আমাদের এই দেশে আমরা মাতৃজ্ঞানে গঙ্গা নদীকে পুজো করি। কিন্তু এখন এই নদীর জল খেলে অসুস্থতা এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। গত কয়েক দশকে গঙ্গা নদীর দুই তীরে অসংখ্য কলকারখানা, শহর, নগর, জনবসতি গড়ে ওঠার ফলে প্রচুর বিষাক্ত আবর্জনা এই নদীর জলে মিশে জলকে দূষিত করেছে। কৃষ্ণা, কাবেরী, গোদাবরী, যমুনা নদীরও একই অবস্থা। পৃথিবীর বিখ্যাত নদীগুলো যেমন হোয়াংহো, টেমস, মিসিসিপি- সবই অতিমাত্রায় দূষিত।

ভেবে দেখো !

পৃথিবীর চারভাগের তিনভাগই জলে ঢাকা, তবুও পৃথিবীর অন্যতম সমস্যা পানীয় জল বা বিশুদ্ধ স্বাদু জলের অভাব। আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, দ: আমেরিকার কিছু অঞ্চলে চরম জল সংকট দেখা গেছে। এর অন্যতম কারণ জলের অতিরিক্ত ব্যবহার এবং জলদূষণ। পৃথিবীর মোট ১০০ ভাগ জলের ৯৭ ভাগই সমুদ্রের নোনা জল। বাকি ৩ ভাগ স্বাদু জলের ২ ভাগই হিমবাহের বরফ হিসাবে রয়েছে। বাকি ১ ভাগ স্বাদুজল হলো নদী জলাশয়, হ্রদ, এবং ভূ-গর্ভের জল।

জল সঙ্কট পূর্ণ রাজ্য

বুঝে দেখো

☞ পৃথিবীর মোট জলকে ২ লিটার ধরে, তার থেকে ১২ চামচ জল তুলে নিলে, এই টুকুই হবে পৃথিবীর মোট স্বাদু জল। বাকিটা সমুদ্রের নোনা জল। এই ১২ চামচ জল কী ভাবে কোথায় আছে

হিমবাহ-৯ চামচ

ভূগর্ভের জল-২ চামচ

স্বাদু জলের হ্রদ-১/২ চামচ

নদীর জল-১/২ চামচ

স্বাদু জলের হিসেব নিকেশ।

স্বাদু জল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ।

বর্তমানে জনসংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে শহরাঞ্চলের বিস্তার, শিল্প কারখানা, যানবাহন। এর ফলে প্রচুর পরিমাণে (দূষিত, বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ, বিভিন্নরকম জীবাণু সংক্রামিত নোংরা, জঞ্জাল, মল-মূত্র) বর্জ্য পদার্থ পরিষ্কার জলের সঙ্গে মিশে জল দূষিত করছে।

উৎস	কী ভাবে জল দূষিত হয়
(১) শিল্পকারখানা থেকে জলদূষণ	পেট্রো-রাসায়নিক শিল্পে, পলিথিন-প্লাস্টিক শিল্পে, জ্বালানি শিল্পে খনিজতেল পরিশোধন শিল্পে, বিভিন্নরকম যানবাহন নির্মাণ, ছোটো ও মাঝারি ইলেকট্রিকাল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে প্রচুর পরিমাণে দূষিত রাসায়নিক পদার্থ, যেমন- অ্যামোনিয়া, ক্লোরিন, ফেনল, সায়ানাইড এবং বিভিন্ন ধাতু, জিঙ্ক, পারদ, সিসা, ক্রোমিয়াম ঘটিত দূষক নালা, নর্দমা দিয়ে নদী বা সমুদ্রের জলে মিশে দূষিত করছে।
(২) গৃহস্থালী থেকে জলদূষণ	গ্রাম এবং শহর এলাকার বিভিন্ন আবর্জনা ও বর্জ্য পদার্থ যেমন গৃহস্থালীর দৈনন্দিন রান্না খাবারের টুকরো, দূষিত বস্তু, শৌচাগারের মল-মূত্র, সাবান, ডিটারজেন্ট, ফিনাইল প্রভৃতি নিকাশি নালার মাধ্যমে ভূগর্ভের জলে, নদীতে, জলাশয়ে পড়ে জলকে দূষিত করে তোলে। এছাড়াও বিভিন্ন খাটাল, পশুশালা, বড়ো বাজার, হাসপাতাল, চিকিৎসাকেন্দ্র থেকে উৎপন্ন বর্জ্য জলকে দূষিত করে।
(৩) কৃষিক্ষেত্র থেকে জলদূষণ	চাষের খেতে বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক সার, কীটনাশক, আগাছানাশক ব্যবহার করা হয়। বৃষ্টির জলে ধুয়ে এই সমস্ত বিষাক্ত রাসায়নিক ভূগর্ভের জলে, জলাশয়ে, নদীতে মিশে জল দূষিত করে। এই সারে থাকা নাইট্রেট-এর কারণে ক্যান্সার শিশুদের মাথায় রক্ত চলাচলে অসুবিধা ঘটায়।
(৪) তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে দূষণ	পারমাণবিক চুল্লি, চিকিৎসাকেন্দ্র বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলো ব্যবহারের পর সমুদ্রে বা নদীতে ফেলা হয়। পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর তেজস্ক্রিয় পদার্থ জলে মিশে জলদূষণ ঘটায়।

(৫) খনিজ তেল থেকে দূষণ	দূর্ঘটনাগ্রস্ত তেলবাহী জাহাজ থেকে অথবা সমুদ্রে অবস্থিত তেলের খনির তেল সমুদ্রে মিশে জলদূষণ ঘটায়।
(৬) তাপীয় দূষণ	তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কারখানায় ব্যবহৃত উষ্ণ দূষিত বর্জ্য জল সরাসরি জলাশয়ে, নদীতে মিশে জলে অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে দেয় ও জলদূষণ ঘটায়।
(৭) বায়ুদূষণের কারণে জলদূষণ	কলকারখানা এবং যানবাহনের ধোঁয়ার মাধ্যমে বাতাসে সালফার ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড ইত্যাদি জমা হয়। বায়ুমণ্ডল থেকে বৃষ্টির জলের সঙ্গে এই দূষিত অ্যাসিড মিশে ভূ-পৃষ্ঠের ও ভূগর্ভের জলকে দূষিত করে।
(৮) আর্সেনিক দূষণ	মাটির নীচের স্তর থেকে অনিয়ন্ত্রিতভাবে অতিরিক্ত জল তুলে নেওয়ার ফলে মাটির নীচের ফাঁকা জায়গায় আর্সেনিক বাতাসের সঙ্গে বিক্রিয়া করে বিষাক্ত ধাতব যৌগ তৈরি করে। এই যৌগ জলে মিশে নলকূপের জলের মাধ্যমে পানীয় জলে মিশে যায়, একইভাবে জলে ফ্লুওরিন ক্লোরিন অতিরিক্ত পরিমাণে থাকলেও জল দূষিত হয়।

খুদে বিজ্ঞানীরা ভেবে দেখো !

কোন ঘটনাগুলোর প্রভাবে কোন ধরনের জলদূষণ ঘটল ঠিক বঝতে পারবে।

(১) ১৯৩২ সালে জাপানে মিনামাটা উপসাগরের উপকূলে একটা রং-এর কারখানা থেকে পারদযুক্ত তরল বর্জ্য সমুদ্রে ফেলা হয়। এই মারাত্মক পারদ দূষণে প্রায় ৩০ বছর ধরে অসংখ্য মানুষ এবং জীব-জন্তু মারা যায়।

(২) উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় কুয়েতে প্রচুর তেলের কূপ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। প্রচুর পরিমাণে খনিজ তেল পারস্য উপসাগরের জলে মিশে অসংখ্য সামুদ্রিক প্রাণীর মৃত্যু হয়।

(৩) হলদিয়া পেট্রো-রসায়ন শিল্প গড়ে ওঠার পর থেকে হলদি নদীর মোহনায় ইলিশ মাছের আনাগোনা কমে গেছে।

(৪) পূর্ব কলকাতার জলাভূমির মাছের ভেড়িগুলোতে মাছ চাষ কমে গেছে। কেরালার কুট্টুনারে, ওড়িশার চিলকায়, অন্ধ্রপ্রদেশের কোলেরুতে কীটনাশক থেকে প্রচুর মাছ মারা গেছে।

(৫) পশ্চিমবঙ্গের মালদা, নদিয়া, হুগলি, হাওড়া, বর্ধমানে উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মাটির নীচের জলে অনেক বেশি মাত্রায় আর্সেনিক রয়েছে। এর ফলে হাতের চেটো ও পায়ের তলায় যে কালো কালো ক্ষত হয়, তাকে '**ব্ল্যাকফুট ব্যাধি**' বলে। এছাড়াও চর্মরোগ, রক্তাল্পতা, যকৃৎ, ফুসফুস, ত্বকের ক্যানসারও হতে পারে। ফ্লুরাইড দূষণ থেকে '**ফ্লুরোসিস**': দাঁত, হাড়ের সমস্যা, পারদ দূষণে মিনামাটা, ক্যাডমিয়াম দূষণে '**ইতাই-ইতাই**' অসুখ হয়।

(৬) সাবান, ডিটারজেন্টের ফসফেট (ক্ষার) বদ্ধ পুকুর, জলাশয়ের জলে মিশলে প্রচুর পরিমাণে শৈবাল, আগাছা, কচুরিপানা বেড়ে যায়। এর ফলে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গিয়ে মাছ ও জলজ প্রাণীরা মারা যায়। একে '**ইউট্রফিকেশন**' বলে।

পিকলুর ডায়েরি

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, সারা বিশ্বের প্রতিবছর প্রায় ৩০ লক্ষ শিশু ডাইরিয়া ও অন্যান্য জলবাহিত সংক্রামক অসুখে মারা যায়। জানো কি শুধু তিনটে জরুরি বিষয় মেনে চললেই জলবাহিত সংক্রমণ প্রায় আটকানো যায় :

১. বিশুদ্ধ পানীয় জল খাওয়া .

২. সাধারণ কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মেনে চলা (যেমন, সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, পরিষ্কার পাত্রে জল রাখা ইত্যাদি)।

৩. শৌচাগারের ব্যবহার করা এবং নোংরা আবর্জনা সঠিকভাবে ফেলা।

অনেক তো জানা গেল। খুদে গোয়েন্দারা, এবার তদন্তে নেমে পড়ো।

অনুসন্ধান

- পানীয় জল কোথা থেকে পাও?
- পানীয় জলে কখনও ঘোলাটে ভাব, নোংরা, দুর্গন্ধ পেয়েছো?
- পানীয় জল কি কোনো উপায়ে বিশুদ্ধ করে তবে ব্যবহার করো?

- গত তিনমাসে তোমার বাড়িতে পাড়ায় বা তোমার ক্লাসে কি কেউ পেটের অসুখে ভুগেছে?
- বাড়ির আবর্জনা, জঞ্জাল, কোথায় ফেলা হয়?
- বাড়ির শৌচাগারের জল কোথায় মেশে?

- বাড়িতে প্রতিমাসে কতটা সাবান শ্যাম্পু বা ডিটারজেন্ট ব্যবহার করা হয়?
- বাড়ির আশপাশের পুকুরে জলাশয়ে কাপড়কাচা গোরু-মোষ স্নান করানো হয়?
- আশেপাশে চাষের জমি থাকলে খোঁজ নিয়ে দেখো সারা বছরে কোন প্রকার রাসায়নিক সার কতটা ব্যবহার করা হয়?
- বাড়ি বা স্কুলের আশপাশে কোনো কারখানা থাকলে, জেনে দেখো কারখানার বর্জ্য জল কি শোধন করার ব্যবস্থা আছে?

জলই জীবন...

☹ বুকুদের এলাকায় দু দিন ধরে জল আসছে না। রান্নার জল, স্নানের জল, খাবার জল প্রায় শেষ, অথচ পাশের পুকুরটা, ডোবাটা জলে ভর্তি। কিন্তু জলটা পচা, ব্যবহার করা যাচ্ছে না।

☹ এ বছর বন্যায় হাসানদের গ্রামটা জলে থৈ থৈ করছে। যেদিকে তাকানো যায় শুধু জল আর জল। অথচ হাসানদের খাবার মতো একটুকুও জল নেই।

এইরকম পরিস্থিতিতে তুমি কী করবে ভেবে দেখো।

খুদে গোয়েন্দারা কাজে লেগে পড়ো!!

প্রথমে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, তারপর বিশ্লেষণ। তারপর সমস্যা ধরা পড়বে। সমস্যা থাকলে সমাধানও আছে। তোমরা যারা গ্রামাঞ্চলে বা মফস্সলে থাকো আশপাশের পুকুর বা জলাশয় থেকে শুরু করতে পারো। জল কীভাবে ব্যবহার হচ্ছে, জলের অবস্থা কী রকম, জল দূষিত হচ্ছে কিনা, জল নষ্ট হচ্ছে কি না —সব খুঁজে দেখতে হবে! যা কিছু দেখলে সে বিষয়ে একটা রিপোর্ট তৈরি করে স্কুলে জমা দাও।

কতজন কী কারণে পুকুরের জল ব্যবহার করে লিখে ফেলো—

সমীক্ষা করে দেখো।

১. তোমার গ্রামে বা পাড়ায় কতগুলো পুকুর আছে? ______

২. এর মধ্যে কতগুলো পুকুর রোজ ব্যবহার করা হয়? ______

৩. পুকুরের পাড়টা কেমন?

(বাঁধানো/ভাঙা/আগাছায় ভর্তি) ____________

৪. পুকুরের পাড়ে কি গাছপালা আছে? কী কী গাছ আছে? ____________

৫. পুকুরের জলে বা পাড়ে কি পোকামাকড়, ছোটো প্রাণী দেখা যায়? ____________

৬. জলের অবস্থা কেমন?

(জল ঘোলা, লালচে সবুজ বা কালচে হয়ে গেছে/জল কমে গেছে। জল শুকিয়ে গেছে/প্রচুর পানা, আগাছায় ভরা/জলে দুর্গন্ধ আছে) ____________

৭. পুকুরের জল দূষিত হয়ে থাকলে, তা কী কারণে হতে পারে?

(গোরু, মোষ স্নান করানো/নিকাশি নালা বা শৌচাগারের জল পুকুরে পড়ছে/চাষের জমি থেকে সার, কীটনাশক/কারখানার বর্জ্য তেল, রং রাসায়নিক/প্রচুর ডিটারজেন্ট, সাবান মিশেছে/গৃহস্থালীর নোংরা আবর্জনা ফেলা হচ্ছে) ____________

জল বিশুদ্ধ করা বেশ সহজ !

- বর্তমানে ভারতের অধিকাংশ মানুষের কাছে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছোলেও প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে এখনও পানীয় জলের একমাত্র উৎস নদী বা পুকুরের জল!

১০০° সে. উষ্ণতায় ১০ মিনিট ফোটালেই জলের বেশিরভাগ জীবাণু নষ্ট হয়ে যায়।

- ঘোলা জলের ক্ষেত্রে সবথেকে সহজ উপায় হলো জলটা ঢাকা দিয়ে কয়েক ঘণ্টা রেখে দেওয়া, তাহলে জলের বেশির ভাগ কাদা বালির কণা থিতিয়ে পড়বে। তখন উপরের পরিষ্কার জলটা ব্যবহার করা যাবে।

- নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্লোরিন জলে দিলেও জীবাণু নষ্ট হয়।

- কড়াইশুঁটি, অড়হর ডাল, মুসুর ডাল এরকম কতকগুলো গাছ জলের নোংরাগুলোকে পাত্রের তলায় থিতিয়ে পড়তে সাহায্য করে।
- কাঠকয়লা, সূক্ষ্ম বালি, নুড়ি পাথর-এর মাধ্যমে বিভিন্ন উপায়ে জল বিশুদ্ধ করা যায়।
- আরও একটা খুব সহজ এবং কার্যকরী উপায় হলো সূর্যের আলোর মাধ্যমে জল শুদ্ধ করা। পাতলা প্লাস্টিকের স্বচ্ছ বোতলে জল ভরে রোদে ছয় সাত ঘণ্টা রেখে দিলে প্রায় ফোটানো জলের মতোই বিশুদ্ধ জল পাওয়া যায়।

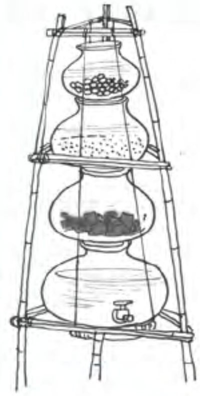

সমীক্ষা করে দেখো

- নলকূপ, কুয়ো বা অন্যান্য পানীয় জলের উৎসের ১০ মিটারের মধ্যে কোনো শৌচালয় আছে কিনা অথবা জৈব বর্জ্য পদার্থ, মল-মূত্র, আবর্জনা, মৃতদেহ) ফেলা হয় কি না।
- তোমার বাড়ির কাছাকাছি কোনো নলকূপের চারপাশে কি জল জমে আছে?
- কুয়োতে যে দড়ি, বালতি ব্যবহার করা হয়, সেগুলো ঠিক মতো পরিষ্কার কিনা।
- নলকূপ বা কুয়োর জল কি ঘোলাটে, গন্ধযুক্ত?

এবার এই সমীক্ষায় যে তথ্য সংগৃহীত হলো, সেগুলো গুছিয়ে নিয়ে, ছোটো একটা প্রবন্ধ লিখে ক্লাসে সবাইকে পড়ে শোনাতে পারো।

তোমরা যারা শহর বা শহরতলিতে থাকো, বাড়ি বা স্কুলের আশপাশে প্রায়ই দেখো মুখ খোলা বা মুখ-ভাঙা কল থেকে অনবরত জল পড়ে নষ্ট হচ্ছে!

- এরকম কতগুলো কল কোথায় কোথায় আছে। তার একটা ধারণা মানচিত্র তৈরি করে ফেলো।
- কাছাকাছি কোনো জল পরিশোধন কেন্দ্র থাকলে অথবা জল সরবরাহ কেন্দ্র থাকলে দেখে এসে তোমার অভিজ্ঞতার বর্ণনা লিখে স্কুলের পত্রিকায় দিতে পারো।
- জলদূষণ জল সংরক্ষণ, জল এর পুনর্ব্যবহার সম্বন্ধে সুন্দর সুন্দর পোস্টার বানিয়ে স্কুল বা বাড়ির আশপাশের এলাকায় আটকে দিলে, জনসচেতনতা বাড়বে।

জলদূষণ প্রতিরোধ

জলদূষণ আটকানোর সঙ্গে সঙ্গে জলের অতিরিক্ত ব্যবহার কমানো এবং বেশি পরিমাণে পুনর্ব্যবহার করলে তবেই সারা পৃথিবীব্যাপী তীব্র জল সংকট মেটানো যেতে পারে।

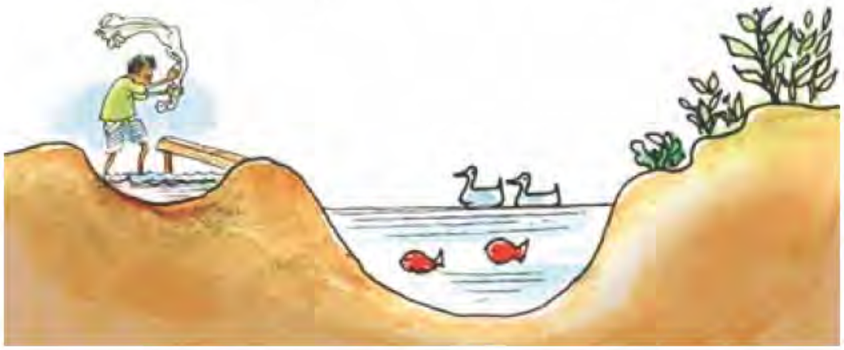

- জলাশয়, নদী বা সমুদ্রের জলে নোংরা আবর্জনা সরাসরি ফেলা যাবে না, গোরু-মোষ স্নান করানো, কাপড় কাচা বন্ধ করতে হবে।
- চাষের ক্ষেতে অতিরিক্ত সার কীটনাশক দেওয়া বন্ধ করতে হবে।
- শহর এবং কলকারখানার দূষিত, বর্জ্য জল শোধন করে তবেই নদী বা সমুদ্রে ফেলা উচিত। ব্যবহার করা জল পরিশোধন করে পুনর্ব্যবহার করতে হবে। ইজরায়েলে ব্যবহৃত জলের ৩০ শতাংশ সেচের কাছে পুনর্ব্যবহৃত হয়।

- তাপবিদ্যুৎ, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বর্জ্য গরম জল ঠান্ডা করে তবেই নদী বা সমুদ্রে ফেলা উচিত।

- বিভিন্নরকম ব্যাকটিরিয়া, শৈবাল এবং রাসায়নিকের মাধ্যমে সমুদ্রে ভাসমান তেলের দূষণ দূর করা যায়।
- নিরাপদ পানীয় জলের জন্য নলকূপের জলের দূষণ-এর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে, বিশুদ্ধ জল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

তুমি কী কী করতে পারো!

- দরকার না থাকলে জলের কল বন্ধ করে রাখবে। এতে একদিকে যেমন বিশুদ্ধ জল নষ্ট হবে না। অন্যদিকে দূষিত জলের পরিমাণও কমবে।
- পরিবেশের ক্ষতি করবে না এরকম জিনিস (যেমন কম ক্ষার বা ক্ষারহীন সাবান, শ্যাম্পু, ডিটারজেন্ট) ব্যবহার করবে।
- বাড়ির নোংরা আবর্জনা, তরল বর্জ্য এমন জায়গায় ফেলা উচিত যাতে কোনোভাবে তা বিশুদ্ধ জলের সঙ্গে না মেশে।
- বাগানে, পুকুরের পাড়ে, কুয়োর চারপাশে নলকূপের নিকাশি নালার ধারে শাক সবজি, ফুলফলের গাছ লাগালে একদিকে যেমন দূষিত জল অনেকটা পরিশুদ্ধ হয় আবার মাটির ক্ষয়ও আটকানো যায়।
- রাষ্ট্র সংঘের মতে প্রতিটি মানুষের প্রতিদিন অন্তত ২০ লিটার বিশুদ্ধ জল প্রয়োজন হয়। কিন্তু আফ্রিকার মাদাগাস্কারের মানুষ প্রতিদিন ৫ লিটার জলও পায় না। অন্যদিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ প্রতিদিন প্রায় ৫০ লিটারের বেশি জল ব্যবহার করে।
- যদি তোমার পরিবারের সবার প্রতিদিন অন্তত ২০ লিটার বিশুদ্ধ জল পাওয়ার ব্যবস্থা হয়। তাহলে—
- কীভাবে কতটা জল ব্যবহার করবে?
- কীভাবে কতটা জল বাঁচাবে বা সঞ্চয় করবে?
- কীভাবে কতটা ব্যবহার করা জল পুনর্ব্যবহার করবে?
- জলদূষণ আটকাতে তুমি (বাড়িতে, পাড়ায়, স্কুলে) আর কী কী করতে পারো ভেবে নিয়ে লিখে ফেলো।
- জলের পুনর্ব্যবহার আরও কীভাবে করা যেতে পারে জানার চেষ্টা করো।

মাটি দূষণ

গ্রীষ্মের লম্বা ছুটির পর রুকু যখন আবার স্কুলে যাওয়া শুরু করল, সে লক্ষ করল তাদের স্কুলের পাশের ছোটো খেলার মাঠটাকে কারা যেন বড়ো বড়ো পাঁচিল দিয়ে ঘিরে ফেলেছে। মাঠের মধ্যে অনেক সিমেন্ট, বালি, পাথর এনে জমা করেছে। এখানে নাকি একটা বড় ফ্ল্যাট-বাড়ি হবে। শুনে তার মনটা ভেঙে যায়।

ইরফানের বাবা রহমত একজন কৃষক। রহমত চাষি তার ছেলেকে শেখায় কীভাবে চাষ করতে হয়, কখন কী ফসল চাষ করতে হয়। ছোট্ট ইরফানও তার বাবাকে কৃষিকাজ সম্পর্কে ভূগোল বইতে যা যা শিখেছে তার গল্প করে। ইদানিং তার বাবার মন খুব খারপ। জমিতে এত সার দেওয়া সত্বেও তেমন ফসল হচ্ছে না।

রুমকিদের বাড়ির পাশের খোলা জায়গাটায় কে বা কারা যেন প্রত্যেকদিনই ময়লা ফেলে যায়। সেই ময়লা পরিষ্কার করার দিকে কারুর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, তবে তার পাশ দিয়ে যাবার সময় নাকে রুমালটা চাপা দেবার কথা সকলেরই মনে থাকে। ময়লার ঢিবি থেকে বেরিয়ে আসা দুর্গন্ধ আশেপাশের পরিবেশটাকেও দূষিত করে তুলেছে। এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে নানাধরনের অসুখবিসুখ দেখা দিচ্ছে।

○ গঙ্গা নদীর দুই তীরের পলি মাটিতে প্রচুর ধান, পাট, শাকসবজি চাষ হয়। কিন্তু পুরুলিয়ার রুক্ষ মাটিতে তেমন ভালো ফসল হয় না।—কেন বলো তো? কারণটা মাটির উর্বরতা বা গুণমান।

○ কারখানার দূষিত বর্জ্য পদার্থ, আবর্জনা, প্লাস্টিক, রাসায়নিক সার, কীট নাশক, তেজস্ক্রিয় রাসায়নিক পদার্থের কারণে **উর্বরতা বা গুণগত মান** হারালে মাটি দূষিত হয়।

মাটিই জীবনের ধারক

মাটি প্রকৃতির সবথেকে বড়ো দান। পৃথিবীর তিনভাগের একভাগ মাত্র স্থলভাগ। আর এই স্থলভাগের উপরের স্তরে রয়েছে মাটি। হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা শিলা ক্ষয় হয়ে এই মাটি তৈরি হয়েছে। মাটি পৃথিবীতে জীবনের ধারক। মানুষসহ সমস্ত উদ্ভিদ-প্রাণীর বাসস্থান, খাদ্য সংস্থান এবং জীবন ধারণ সবই মাটির উপরেই।

তোমাদের বাগান বা বাড়ির টবে যে ফুলগাছটা আছে, সেটাতে প্রত্যেক দিন খুব সুন্দর সুন্দর ফুল ফোটে। আচ্ছা ঐ টবটাতে যদি ময়লা তেল জাতীয় কিছু পড়ে, তবে কী হবে বলতে পারো?

ঠিক ধরেছ গাছটা মরে যাবে। কেন? কারণ গাছের গোড়ায় যে মাটিটা থেকে গাছ পুষ্টি পায়, সেই মাটিটাই যে দূষিত হয়ে গেছে।

মাটি দূষণের কারণ

পৃথিবীর মোট স্থলভাগের মাত্র ১০ শতাংশে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ মানুষ বাস করছে। প্রবল জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে মাটির অতিরিক্ত এবং অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, মাটির ক্ষয় এবং দূষণের প্রধান কারণ।

মাটি দূষণ

উৎস — **পদ্ধতি ও প্রভাব**

১. নগরায়ন

জনসংখ্যা বৃদ্ধি
↓
বাসস্থানের চাহিদা বৃদ্ধি
↓
বৃক্ষছেদন → মাটির ক্ষয় → মাটি দূষণ

২. কৃষিকাজ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে খাদ্যের প্রয়োজন বৃদ্ধি
↓
বেশি উৎপাদনের জন্য রাসায়নিক সার, কীটনাশকের অতিরিক্ত ব্যবহার
↓
ফসলের খাদ্যগুণ নষ্ট হয়, ফসলে কীটনাশকের অংশ থেকে গেলে তা থেকে ক্যানসারও হতে পারে
↓
মাটিতে থাকা ছোটো প্রাণী, পোকামাকড় মারা যায়
↓
জৈব পদার্থের অভাব
↓
মাটির গুণমান নষ্ট হয়

একই শস্যের বহুবার চাষ
↓
মাটির উর্বরতা কমে যায়

৩. শিল্প উৎপাদন

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি

শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি
↓
শিল্পজাত দ্রব্যের বর্জ্য
↓
মাটির উপরের ও ভূগর্ভের জল দূষণ

শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি
↓
কলকারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাসের কারণে বায়ুদূষণ
↓
অ্যাসিড বৃষ্টি
↓
মাটি দূষণ

৪. গৃহস্থালী

বাড়ি, বাজার, হাসপাতাল শহরের আবর্জনার স্তূপে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া জন্মায়

শৌচাগারের জল, মলমূত্র মাটিতে মিশলে বিভিন্ন রকম রোগের জীবাণু থেকে অসুখের সংক্রমণ

পলিথিন, প্লাস্টিক মাটিতে মিশে যায় না
↓
এগুলো থেকে বিষাক্ত রাসায়নিক মাটিতে মিশে মাটি দূষণ ঘটায়

৫. যানবাহন

নগরায়ণের ফলে যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি
↓
যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়ায় বায়ুদূষণ
↓
অ্যাসিড বৃষ্টি
↓
মৃত্তিকা দূষণ

৭. তাপবিদ্যুৎ, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র, ইটভাটার ছাই, পারমাণবিক কেন্দ্রের তেজস্ক্রিয় বর্জ্য

↓

মাটি দূষণ

এইভাবে দূষিত মাটিতে উৎপন্ন ফসল ও উদ্ভিদে ক্ষতিকর তেজস্ক্রিয় বিকিরণ এর প্রভাব থাকে

ইটভাটার ইট তৈরির জন্য অতিরিক্ত মাটি কাটা

↓

মাটি ক্ষয়

অনুসন্ধান

তোমার গ্রামে বা পাড়ায় মাটি দূষণের পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে লিখে ফেলো।

১। পাড়া বা গ্রামের নাম..................

২। তোমার বাড়ির জঞ্জাল কি কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলা হয় ?

৩। সেই জঞ্জাল কি প্রতিদিন পরিষ্কার করা হয়?

৪। কলকারখানার আশেপাশের অঞ্চলের মাটির সঙ্গে তোমার বাড়ির আশপাশের মাটির রঙের কি কোনো তফাৎ দেখতে পাও?

৫। তোমার এলাকায় কোন কোন কারণে মাটি দূষিত হচ্ছে তার একটি তালিকা তৈরি করো।

পিকলুর ডায়েরি

• ১৯৮৪ সালের মধ্যরাতে ভারতের ভূপালে ইউনিয়ন কার্বাইড-এর কারখানা থেকে অতি বিষাক্ত গ্যাস বাতাসে মেশে। এরফলে প্রচুর মানুষ মারা যায় এবং বহু মানুষ পঙ্গু হয়ে যায়।

• ১৯৮৬ ইউক্রেনের চেরনোবিল পরমাণু কেন্দ্রে এবং ২০১১ সালে জাপানের ফুকুশিমা ডাইচিতে দুর্ঘটনার ফলে আশপাশের অঞ্চলের মাটি, জল, বাতাসে ভয়াবহ তেজস্ক্রিয় দূষণ ছড়ায় এবং প্রচুর মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মেলাও তো দেখি

ক	খ
১. কলকারখানার ধোঁয়া	১. নগরায়ণের প্রসার ঘটে।
২. কৃষিজমিতে কীটনাশক ও সারের অতিরিক্ত ব্যবহার	২. মৃত্তিকা দূষণের অন্যতম কারণ।
৩. জনসংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধির ফলে	৩. মাটির উর্বরতা বাড়ায়।
৪. পরিবেশে মৃত্তিকার দূষণ	৪. অ্যাসিড বৃষ্টি ঘটাতে সাহায্য করে।
৫. মাটিতে অবস্থিত বিভিন্ন প্রাণী যেমন কেঁচো, পোকামাকড় ইত্যাদি	৫. মাটির উর্বরাশক্তি নষ্ট করে।
৬. যত্রতত্র বর্জ্যপদার্থ ফেলা	৬. নানা প্রকার রোগব্যাধির জন্ম দেয়।

মাটি দূষণ প্রতিরোধের উপায়

মাটির এই দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, যদি আমরা সকলে একটু সচেতন হই — আমাদের পরিবেশ সম্পর্কে, পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে এবং সর্বোপরি আমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে।

করা উচিত

১. গৃহস্থালীর বর্জ্য পদার্থ বা আবর্জনা সঠিক জায়গায় ফেলা।

২. পলিথিন-এর বদলে কাগজ বা পাটের থলের ব্যবহার।

৩. তোমার বাড়ির উঠোন, বাগান, রাস্তার ধারে বেশি করে গাছপালা লাগানো।

৪. কৃষি জমিতে জৈব সারের বেশি পরিমাণে ব্যবহার।

৫. স্কুলের বা বাড়ির আশেপাশের মানুষদের সচেতন করা।

করা উচিত নয়

১. যেখানে সেখানে জঞ্জাল বা আবর্জনা ফেলা।

২. গাছপালা কাটা কিংবা গাছপালার ক্ষতি করা।

৩. কৃষিজমিতে বেশি পরিমাণে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক-এর ব্যবহার।

৪. শৌচাগার ছাড়া যত্রতত্র মল-মূত্র ত্যাগ করা।

এশিয়া : রাজনৈতিক

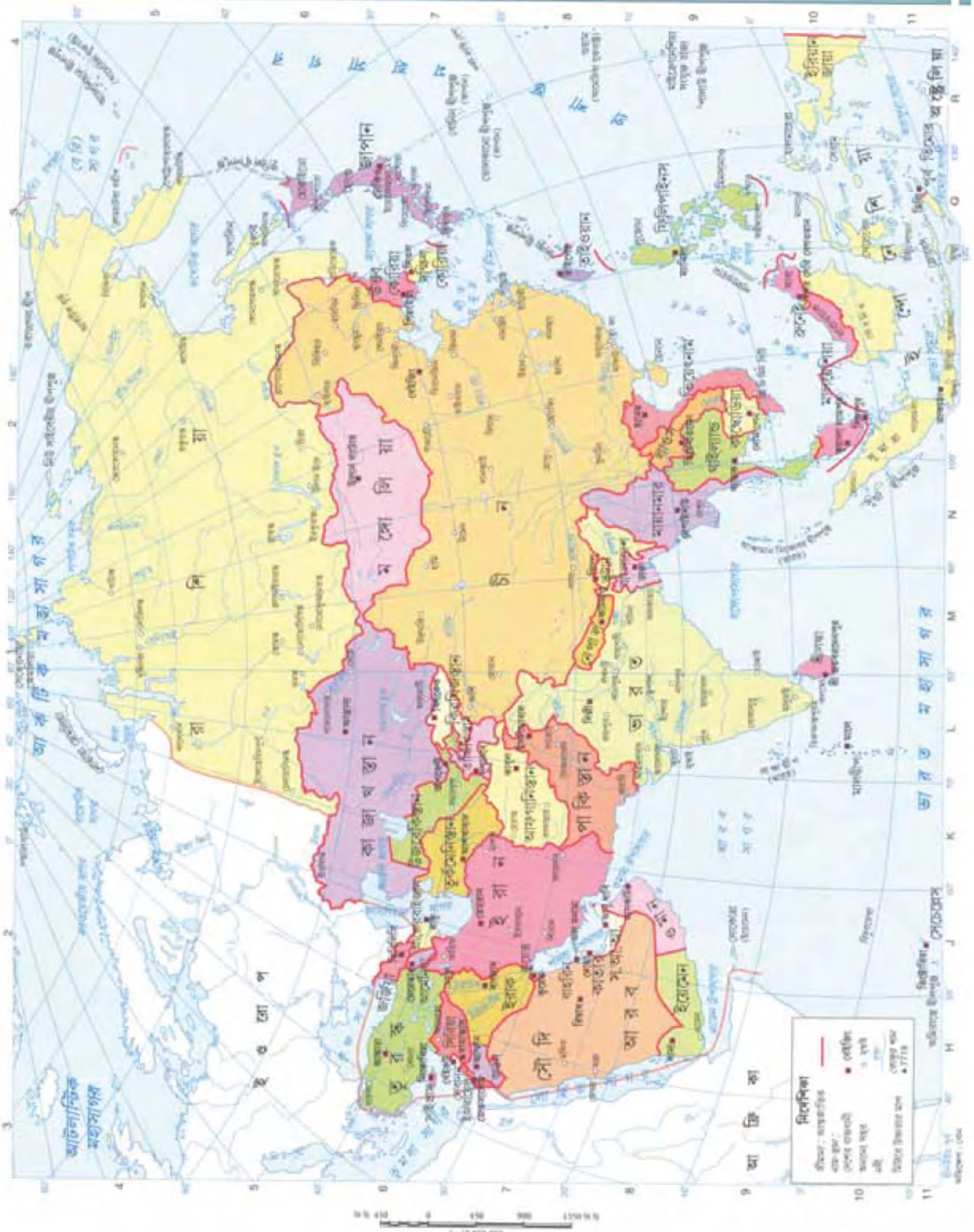

এশিয়া মহাদেশ

'পৃথিবীর ছাদ' পামীর মালভূমি

মাউন্ট এভারেস্ট, স্থলভাগের উচ্চতম অংশ

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সমভূমি বৃহত্তম বদ্বীপ সমভূমি

পৃথিবীর বৃহত্তম বনভূমি 'তৈগা'

বৃহত্তম হ্রদ কাস্পিয়ান সাগর। সর্বাধিক বৃষ্টিবহুল স্থান (মৌসিনরাম)

লবণাক্ত হ্রদ মরুসাগর, স্থলভাগের নিম্নতম অংশ

সর্বাধিক জনবহুল মহাদেশ, পৃথিবীর ৬০% মানুষ বাস করে

পৃথিবীর স্থলভাগের তিনভাগের একভাগ জুড়ে রয়েছে বৃহত্তম, জনবহুল মহাদেশ এশিয়া। ভাবলে অবাক হবে, চারটে ইউরোপ অথবা দেড়খানা আফ্রিকার সমান আমাদের এই মহাদেশ এতই বিশাল যে পশ্চিম প্রান্তে যখন সূর্য ওঠে, পূর্বপ্রান্তে তখন সূর্যাস্তের সময় হয়ে যায়। সুউচ্চ পর্বতশ্রেণি,বিরাট মালভূমি,বিস্তীর্ণ সমভূমি আর উর্বর নদী উপত্যকার মহাদেশ এশিয়ায় এমন কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্য কোনো মহাদেশে নেই। তাই এশিয়াকে **'চরম বৈশিষ্ট্যের মহাদেশ'** (Continent of Extremes) বলা হয়।

এশিয়া মহাদেশ : সভ্যতার জন্মক্ষেত্র প্রাচ্য সংস্কৃতির ঐতিহ্য (Cradle of civilization)

- জাতি, ধর্ম,বর্ণ, শিল্প-সংস্কৃতি, জনগোষ্ঠী, জীবনযাত্রার বৈচিত্র্যে অনন্য এই মহাদেশে—
- খ্রিস্টজন্মের ৩৫০০-৫০০০ বছর আগে এশিয়ার বড়ো বড়ো নদীগুলোর উর্বর উপত্যকায় অনেকগুলো নদীমাতৃক সভ্যতার জন্ম হয়েছিল।
- সিন্ধুনদের ধারে হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়ো ও সিন্ধুসভ্যতার (বর্তমানে ভারত এবং পাকিস্তানে) বিকাশ হয়েছিল।
- তেমনই টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদী উপত্যকায় উন্নত মেসোপটেমিয়া, সুমের সভ্যতার (বর্তমানে তুরস্ক এবং ইরাকে) উদ্ভব হয়েছিল।
- হোয়াং-হো নদী উপত্যকা ছিল চিন সভ্যতার আঁতুড়ঘর।
- অতীতকাল থেকে আজও এশিয়া প্রাচ্য সংস্কৃতির ধারক এবং ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ।

পিকলুর ডায়েরি

- **আয়তন :** ৪৪,৫৭৯,০০ বর্গ কিমি.।
- **অবস্থান ও সীমা :** ১°১৬' দ: অক্ষাংশ ৭৭° ৪৪' উ: অক্ষাংশ এবং ১৭০° প: দ্রাঘিমা-২৬° পূ: দ্রাঘিমা।

পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর, পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর, কাস্পিয়ান সাগর, উত্তরে সুমেরু মহাসাগর ও দক্ষিণে ভারত মহাসাগর।

- এশিয়া এবং ইউরোপ দুটো মহাদেশ 'ইউরেশিয়া' নামক অখণ্ড স্থল- ভাগের অংশ।
- এশিয়া ও ইউরোপের মাঝে রয়েছে ইউরাল পর্বত এবং ইউরাল নদী।
- এশিয়া ও আফ্রিকাকে আলাদা করেছে লোহিত সাগর ও সুয়েজ খাল।
- **দেশের সংখ্যা :** ৪৮টি
- **বিখ্যাত শহর :** টোকিয়ো, করাচী, লাহোর, দিল্লি, কলকাতা, বেজিং ইত্যাদি।

এশিয়ার প্রাকৃতিক পরিচয়

এশিয়ার ভূপ্রাকৃতিক মানচিত্রটা দেখলে অবাক হতে হয়। পৃথিবীর আর কোনো মহাদেশ নেই যার মাঝখানটাতে এত পাহাড় পর্বতের সমাবেশ। পামীর এবং আর্মেনীয়-এই দুটো পর্বত গ্রন্থি থেকে খুব উঁচু উঁচু পর্বতমালা (যাদের গড় উচ্চতা ৪০০০ মিটারেরও বেশি) ছড়িয়ে গেছে নানা দিকে। এই পার্বত্য অঞ্চলটি পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর থেকে পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত রয়েছে।

মধ্যভাগের পার্বত্য অঞ্চল

পামীর পর্বতগ্রন্থি ও আর্মেনীয়া পর্বতগ্রন্থি থেকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে যাওয়া পর্বতমালা।

ঠিক ঠিক লিখে ফেলো .....

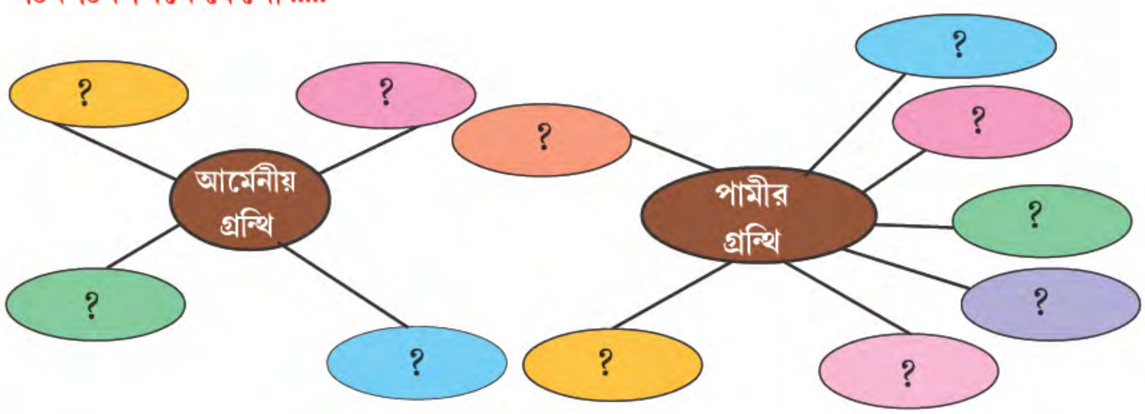

হিমালয় পর্বতশ্রেণি

- হিমালয় ও কুয়েনলুন পর্বতের মাঝখানে আছে—তিব্বত মালভূমি। তিব্বতের মালভূমির উত্তর পূর্ব দিকে রয়েছে — মঙ্গোলিয়া মালভূমি। পন্টিক ও টরাস্ পর্বতশ্রেণির মধ্যে আছে—আনাতোলিয়া মালভূমি। আনাতোলিয়া মালভূমির দক্ষিণদিক থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা একটি—গ্রস্ত উপত্যকা।

- মধ্যভাগের পার্বত্য অঞ্চলের দক্ষিণে বেশ কিছু প্রাচীন মালভূমি রয়েছে যা শক্ত শিলা দিয়ে গঠিত। নদীর প্রবাহ দেখলে বোঝা যায় প্রত্যেকটির ঢাল পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে।

দক্ষিণের প্রাচীন মালভূমি

আরবের মালভূমি | দাক্ষিণাত্যের মালভূমি | ইন্দোচিন মালভূমি

এই তিনটি মালভূমি কোন কোন দেশের অন্তর্গত তা রাজনৈতিক মানচিত্র থেকে বার করে ফেলো।

মালভূমির নাম	কোন দেশে অবস্থিত
আরবের মালভূমি	
দাক্ষিণাত্যের মালভূমি	
ইন্দোচিন মালভূমি	

এশিয়ার রাজনৈতিক মানচিত্র

- মধ্যভাগের পার্বত্য অঞ্চলের উত্তরে একটি বড়ো সমতলভূমি রয়েছে। এশিয়ার উত্তরের এই সমভূমি পৃথিবীর বৃহত্তম সমভূমি। সমভূমির মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীগুলির প্রবাহ দেখে বোঝা যায় অঞ্চলটি দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে ঢালু।

উত্তরের বিশাল সমতলভূমি

তুরানের নিম্নভূমি

উত্তরের সমভূমির দক্ষিণ পশ্চিমে কাস্পিয়ান ও আরল সাগরের চারদিকে অবস্থিত এই নিম্নভূমি তুরানের নিম্নভূমি নামে পরিচিত।

সাইবেরিয়ার সমভূমি

এশিয়ার উত্তরে ওব, ইনিসি ও লেনা নদীর পলিসঞ্চয়ে এবং হিমবাহের কাজের ফলে এই সমভূমি সৃষ্টি হয়েছে। এই সমভূমিতে মাঝে মাঝে বন্যা হয়।

পূর্বের উচ্চভূমি বা শিল্ড সমভূমি।

এই সমভূমির উত্তর পূর্ব দিকে প্রাচীন মালভূমি ক্ষয়ে যাবার ফলে যে সমভূমি সৃষ্টি হয়েছে তাকে পূর্বের উচ্চভূমি বা শিল্ড সমভূমি বলে।

এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণপূর্ব দিকে কতগুলি নদী রয়েছে ও তাদের পলি দ্বারা কয়েকটি সমভূমি তৈরি হয়েছে। যেমন – (১) উত্তর চিন সমভূমি। (২) সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সমভূমি। (৩) মেসোপটেমিয়া সমভূমি।

এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর কতগুলি দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ রয়েছে যেমন — (১) জাপানের দ্বীপসমূহ। (২) ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপসমূহ। (৩) কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ। (৪) ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ।

যে কোনো জায়গার ভূমিরূপের সঙ্গে নদী প্রবাহের সম্পর্ক থাকে। নদী ভূমিরূপকে অনুসরণ করে, ভূমির ঢাল যে দিকে নদীও সেইদিকে প্রবাহিত হয়। এশিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় নদীগুলির অধিকাংশই মাঝখানের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে উত্তর দক্ষিণ ও পূর্বদিকে চলে গেছে।

এশিয়ার নদ নদী

উত্তর দিকে প্রবাহিত নদী:

নদীর নাম	উৎস	দৈর্ঘ্য(কিমি)	মোহনা	নদীর বৈশিষ্ট্য
ওব নদী	আলতাই পর্বত	৩৬৫০	ওব সাগর	১. এই নদীগুলির মোহনা উচ্চ অক্ষাংশের হিমমণ্ডলে অবস্থিত। তাই বছরের ৮ থেকে ৯ মাস বরফে ঢাকা থাকে। শরৎ ও বসন্তকালে পার্বত্য অঞ্চলে বেশি বৃষ্টি হলে, ঐ জল নদীর মোহনার বরফে বাধা পেয়ে বন্যা সৃষ্টি করে। ২.নদীগুলি যাতায়াতের অনুপযোগী। ৩. নদীউপত্যকা জনবিরল। ৪. নদী অববাহিকায় একাধিক জলাভূমি দেখা যায়।
ইনিসি নদী	সায়ান পর্বত	৫৫৪০	ইনিসি উপসাগর	
লেনা নদী	বৈকাল পর্বত	৪২৭০	লাপ্টেভিক সাগর	

ঠিক্ ঠিক্ লিখে ফেলো :

১. ওব, ইনিসি ও লেনা নদী কোন দিক থেকে কোন দিকে প্রবাহিত হয়েছে?.................
২. উত্তর দিকে প্রবাহিত নদীগুলির মধ্যে কোন নদীর দৈর্ঘ্য সবথেকে বেশি? ....
৩. এশিয়ার উত্তর বাহিনী নদীগুলিতে প্রায়ই বন্যা হয় কেন? ....

❑ দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত নদী:

নদীর নাম	নদীর উৎস	নদীর দৈর্ঘ্য (কিমি)	মোহনা	নদীর বৈশিষ্ট্য
গঙ্গা নদী	গঙ্গোত্রী হিমবাহ	২৫১০	বঙ্গোপসাগর	১. নদীগুলি মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত ও পার্বত্য অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হবার জন্য বৃষ্টির জল ও বরফগলা জলে পুষ্ট। ২. নদীর নিম্নগতিতে বর্ষাকালে বন্যা দেখা যায়। ৩. অধিকাংশ নদীগুলির অববাহিকা অঞ্চল ঘনবসতি পূর্ণ। ৪. নদীগুলি পরিবহন ও সেচের কাজে বিশেষ উপযোগী। ৫. টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মিলিত প্রবাহের নাম সাত-এল-আরব।
ব্রহ্মপুত্র নদী	তিব্বতের মানস সরোবরের কাছে চেমায়ুং দং হিমবাহ	২৫৮০	বঙ্গোপসাগর	
সিন্ধু নদী	তিব্বতের মানস সরোবর	২৮৮০	আরব সাগর	
মেকং নদী	কুয়েনলুন পর্বত	৪৩৫০	দক্ষিণ চিনসাগর	
মেনাম নদী	শান মালভূমি	৩৬৫	শ্যামসাগর	
ইরাবতী নদী	ইউনান মালভূমি	২০৯০	মার্তাবান উপসাগর	
টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী	আর্মেনীয় মালভূমির কুর্দিস্তান পর্বত	১৮৫০ ২৮০০	পারস্য উপসাগর	

বলোতো দেখি :

১. এশিয়ার দক্ষিণবাহিনী নদীগুলির মধ্যে কোন নদীটি তিব্বতের মানস সরোবরের কাছ থেকে উৎপন্ন হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে?

২. এশিয়ার দক্ষিণ বাহিনী নদীগুলির মধ্যে দীর্ঘতম নদীর নাম কী? নদীটির দৈর্ঘ্য কত কিমি?

❑ পূর্ব দিকে প্রবাহিত নদী:

নদীর নাম	নদীর উৎস	নদীর দৈর্ঘ্য (কিমি)	মোহনা	নদীর বৈশিষ্ট্য
ইয়াং সি কিয়াং	কুয়েনলুন পর্বতের দক্ষিণে গোলাডানডং পর্বতশৃঙ্গ	৫৫৩০	চিন সাগর	১. নদী অববাহিকা ঘনবসতিপূর্ণ। ২. নদীগুলি নিম্নপ্রবাহে পলি সঞ্চয় করে সমভূমি গড়ে তুলেছে ফলে এখানে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি ঘটেছে। ৩. ইয়াংসি কিয়াং নদীকে স্বর্ণ রেণুর নদী বলে। ৪. হোয়াং হো নদী হলুদ রঙের পলি যুক্ত জল বহন করে বলে একে পীত নদী বলে
সি কিয়াং	ইউনান মালভূমির বায়ানহারা পর্বত	১৯২০	চিন সাগর	
হোয়াং হো	কুয়েনলুন পর্বত	৫৪৬০	পোহাই উপ-উপসাগর	
আমুর	রাশিয়ার ইয়াব্লোনয় পর্বত	৪৪৪০	ওখটস্ক সাগর	

বলতে পারো :

১. এশিয়া মহাদেশের কোন নদীকে 'স্বর্ণরেণুর' নদী বলে?

২. এশিয়ার পূর্বদিকে প্রবাহিত দুটি নদীর নাম করো যারা চিনসাগরে পড়েছে?

৩. এশিয়ার কোন নদীকে পীত নদী বলে?

৪. এশিয়ার দীর্ঘতম নদী কোনটি ?

জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ

সম্পূর্ণ উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত এশিয়া মহাদেশের উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তার এত বেশি যে, পৃথিবীর প্রায় সব ধরনের জলবায়ু এই মহাদেশে দেখা যায়। কোনো দেশ বা মহাদেশের জলবায়ুর সঙ্গে স্বাভাবিক উদ্ভিদের একটা নিবিড় সম্পর্ক থাকে। জলবায়ুর উপর নির্ভর করে স্বাভাবিক উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য। নিরক্ষীয় জলবায়ুতে জন্মায় চিরহরিৎ বা চিরসবুজ উদ্ভিদ। আবার মরু অঞ্চলে জন্মায় কাঁটাজাতীয় উদ্ভিদ।

এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন জায়গায় জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের বৈচিত্র্যের কারণ

ধারণা মানচিত্র থেকে বুঝে নাও

অক্ষরেখার অবস্থান

নিরক্ষরেখা থেকে যত মেরুর দিকে যাওয়া যায় সূর্য রশ্মি তত বাঁকা ভাবে পড়ে ফলে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা কমে যেতে থাকে।

↓

এশিয়া মহাদেশটি ১০° দঃ অক্ষরেখা থেকে ৮২° উঃ অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত। **তাহলে এশিয়ার দক্ষিণ থেকে উত্তরে কী ধরনের জলবায়ু দেখা যাবে?**

উচ্চতার তারতম্য

প্রতি ১০০০ মি. বা ১কিমি উচ্চতায় গড়ে ৬.৪° সে. করে তাপমাত্রা কমে যায়।

↓

এশিয়া মহাদেশের মধ্য ভাগের উঁচু পার্বত্য অঞ্চলের গড় উচ্চতা ৪০০০ মিটারেও বেশি। **তাহলে সেখানে তাপমাত্রা কীরকম হতে পারে?**

সমুদ্র থেকে দূরত্ব

সমুদ্রের ধারে ঠান্ডা গরম কোনোটাই খুব বেশি হয় না। অর্থাৎ নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু দেখা যায়। কিন্তু সমুদ্র থেকে দূরে অবস্থিত কোনো স্থানের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন হয় অর্থাৎ শীতকালে প্রচণ্ড ঠান্ডা আর গরমকালে প্রচণ্ড গরম হয়।

↓

এশিয়ার মধ্যভাগের বেশির ভাগ অঞ্চলেরই সমুদ্র থেকে দূরত্ব বেশি। **তাহলে ঐ অঞ্চলের জলবায়ু কেমন হতে পারে?**

এশিয়ার জলবায়ু অঞ্চল

জলবায়ুর বৈচিত্র্য অনুসারে এশিয়া মহাদেশকে বেশ কয়েকটি জলবায়ু অঞ্চলে ভাগ করা যায়।

জলবায়ু অঞ্চল	প্রধান বৈশিষ্ট্য	স্বাভাবিক উদ্ভিদ
নিরক্ষরেখার কাছাকাছি ১০° উত্তর অক্ষরেখা থেকে ১০° দক্ষিণ অক্ষরেখার মধ্যে ইন্দোনেশিয়া, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশে **নিরক্ষীয় জলবায়ু** দেখা যায়।	✦ সূর্য রশ্মি লম্বভাবে পড়ায় সারাবছর অধিক উষ্ণতা। ✦ বার্ষিক গড় উষ্ণতা ২৫° থেকে ৩০° সে.। ✦ প্রতিদিন বিকেলে পরিচলন বৃষ্টি হয়। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০০ থেকে ২৫০ সেমি.।	নিরক্ষীয় অঞ্চলে বেশি উষ্ণতা ও বেশি বৃষ্টিপাতের জন্য ঘন চিরহরিৎ বা চিরসবুজ গাছ দেখা যায় (মেহগিনি, রোজউড, আয়রন উড, সেগুন, আবলুস, রবার, কোকো, সিঙ্কোনা)।
১০° উত্তর অক্ষরেখা থেকে ৩০° উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, দক্ষিণ চিন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে **মৌসুমি জলবায়ু** দেখা যায়।	✦ মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলে বছরের ছ'মাস উত্তর-পূর্ব পরের ছ'মাস দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে বায়ু	আর্দ্র গ্রীষ্মকাল এবং শুষ্ক শীতকাল বলে এখানে চিরহরিৎ বা চিরসবুজ এবং

জলবায়ু অঞ্চল	প্রধান বৈশিষ্ট্য	স্বাভাবিক উদ্ভিদ
	প্রবাহিত হয়। ✦ গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা থাকে ২০°-২৮° সে. আর শীতকালে ১৫°-২০° সে.। ✦ গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গড়ে ১০০-২০০ সেমি.।	পর্ণমোচী বা পাতাঝরা দুই ধরনের গাছই জন্মায় (আম, জাম, মেহগিনি, বাঁশ, আবলুস, শাল, সেগুন, বট, অশ্বত্থ, শিশু প্রভৃতি)।
চিনের উত্তর দিক ও মাঝখানটা, এবং দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের কিছু অংশে বিশেষ ধরনের জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ দেখা যায় যা **চিন দেশীয় জলবায়ু** নামে পরিচিত।	✦ এখানে গ্রীষ্মকালে উষ্ণতা থাকে ৩০° সে.। শীতকালে উষ্ণতা থাকে ৪°-১২° সে.। ✦ গ্রীষ্মকালে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে গড়ে ১০০ সেমি. বৃষ্টিপাত হয়।	পর্ণমোচী (সেগুন, ফার, বিচ, পাম, লরেল) এবং চিরহরিৎ (মেহগিনি, চেস্টনাট, ওক প্রভৃতি) গাছ জন্মায়।
ভূমধ্যসাগরের তীরে সিরিয়া, লেবানন, তুরস্ক, ইজরায়েল, জর্ডন প্রভৃতি দেশে **ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু** দেখা যায়। 	✦ এখানে গ্রীষ্মকালে উষ্ণতা থাকে ২১°-২৭° সে.। ✦ শীতকালে ৫°-১০° সে.। ✦ পশ্চিমাবায়ুর প্রভাবে এখানে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩০-৫০ সেমি.।	প্রচুর ফলের গাছ যেমন- জলপাই, আঙুর, লেবু, এছাড়া অন্যান্য গাছগুলো হলো- কর্ক, ওক, অলিভ এবং কয়েকটি ঝোপঝাড় জাতীয় গাছ জন্মায় যেমন—লরেল, ল্যাভেন্ডার, রোজমেরি।
আরবের মরুভূমি, ভারত ও পাকিস্তানের থর মরুভূমি, ইরাক, ইরান, কুয়েত- এই সব দেশগুলোর উষ্ণতা খুব বেশি ও বৃষ্টিপাত খুব কম, তাই এখানে **উষ্ণমরু** প্রকৃতির চরমভাবাপন্ন জলবায়ু দেখা যায়। 	✦ গ্রীষ্মকালে উষ্ণতা থাকে ৩°-৩৫° সে.। ✦ শীতকালে উষ্ণতা থাকে ১৫°-২৫°সে.। ✦ এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাত্র ১০-২৫ সেমি.। ✦ এশিয়া মহাদেশের উষ্ণতম স্থান পাকিস্তানের জেকোবাবাদ (উষ্ণতা ৫২° সে., এই জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত।	এই মরুভূমি অঞ্চলে সাধারণত কাঁটাজাতীয় গাছ জন্মায়, যেমন— বাবলা, ফণীমনসা, খেজুর ইত্যাদি। বৃষ্টিপাত কম হবার জন্য গাছগুলির কাণ্ড ও পাতা মোম জাতীয় পদার্থ দিয়ে ঢাকা থাকে যাতে প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় গাছের জল বেরিয়ে না যায়।

জলবায়ু অঞ্চল	প্রধান বৈশিষ্ট্য	স্বাভাবিক উদ্ভিদ
রাশিয়ার সাইবেরিয়া ও সাখালিন দ্বীপপুঞ্জে **সাইবেরীয় জলবায়ু** দেখা যায়। আরো উত্তরে সুমেরু বৃত্তে **তুন্দ্রা জলবায়ু** দেখা যায়। 	✦ এখানে অতিশীতল ও দীর্ঘস্থায়ী শীতকাল। বছরের ৭ থেকে ৮ মাস বরফ পড়ে। উষ্ণতা থাকে হিমাঙ্কের নীচে। গ্রীষ্মকালে উষ্ণতা থাকে গড়ে১৫° সে.। ✦ তুন্দ্রা জলবায়ু অঞ্চলে সারাবছর তাপমাত্রা হিমাঙ্কে নীচে থাকে। শীতকালে প্রবল তুষারপাত হয়।	গাছগুলি শঙ্কু আকৃতির হয় এবং গাছের পাতাগুলি ছুঁচালো হয়। পাইন,ফার, স্প্রুস, লার্চ, বার্চ, সিডার, উইলো প্রভৃতি গাছ জন্মায়। রাশিয়ার সরলবর্গীয় গাছের **তৈগা** বনভূমি পৃথিবীর বৃহত্তম সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি। তুন্দ্রা জলবায়ু অঞ্চলে মস, লাইকেন, শৈবাল জন্মায়।

চিনের ইয়াংসি কিয়াং নদী অববাহিকা

এশিয়া মহাদেশের একটি উন্নত সমৃদ্ধশালী অঞ্চল হল ইয়াংসি কিয়াং নদীর অববাহিকা অঞ্চল। ইয়াংসি কিয়াং এশিয়া মহাদেশের দীর্ঘতম নদী (৫৫৩০ কিমি.)।

ইয়াংসি কিয়াং নদীটি কুয়েনলুন পর্বতের একটি হিমবাহ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তারপর পূর্ব দিকে বয়ে গিয়ে চিন সাগরে মিশেছে।

ভূপ্রকৃতির পার্থক্য, মৃত্তিকা ও জলবায়ুর পার্থক্যের জন্য ইয়াংসি কিয়াং নদীর অববাহিকাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

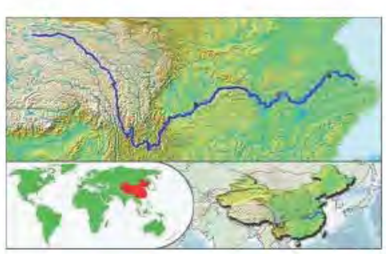

ইয়াংসি কিয়াং নদীর অববাহিকা

ইয়াংসি-কিয়াং নদীর উৎস অঞ্চলে চারটি উপনদীর সঞ্চয় কার্যের ফলে **সেজুয়ান অববাহিকা** তৈরি হয়েছে। এই অববাহিকাটি লাল রঙের বেলে পাথর দিয়ে তৈরি বলে একে **রেড বেসিন** বলা হয়। এই রেডবেসিন অববাহিকাটি **উৎস** থেকে **ইচাং** পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানকার জলবায়ু খুব মনোরম। এই অববাহিকা কৃষি সমৃদ্ধ জনবহুল অঞ্চল।

ইচাং থেকে হুনান পর্যন্ত মধ্য ইয়াংসি অববাহিকাটি উর্বর সমতল ভূমি। এই অঞ্চলটিতে নবীন পলিমাটি থাকার জন্য এখানে কৃষিকাজ খুব ভালো হয়। এখানে প্রচুর পরিমাণে ধান চাষ হয়। এই জন্য **হুনান প্রদেশকে চিনের ধানের গোলা বলা হয়**। ধান ছাড়া এখানে গম, কার্পাস, আখ, তৈলবীজ প্রভৃতি ফসল প্রচুর পরিমাণে চাষ হয়। ইয়াংসি কিয়াং-এর মধ্য অববাহিকায় প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদন হয় বলে একে **চিনের শস্য ভাণ্ডার বলা** হয়।

হুনান থেকে চিনসাগরের মোহনা পর্যন্ত অঞ্চলটি ইয়াংসি কিয়াং-এর ব-দ্বীপ অঞ্চল। ইউরোপ মহাদেশের হল্যান্ডের মতো এই অঞ্চলটিতে বহু জলাভূমি, খাল ও সমুদ্র থেকে উদ্ধার করা জমি বা পোল্ডারভূমি দেখা যায় বলে এই অঞ্চলকে **এশিয়ার হল্যান্ড** বা **চিনের হল্যান্ড** বলা হয়। নিবিড় কৃষি পদ্ধতিতে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়।

সাংহাই শহরটি চিনের বৃহত্তম শহর, শিল্পকেন্দ্র ও শ্রেষ্ঠ বন্দর। কার্পাস বয়ন শিল্পের উন্নতির জন্য একে **চিনের ম্যাঞ্চেস্টার** বলা হয়।

ইয়াংসি কিয়াং অববাহিকায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণ

কৃষির উন্নতি

অনুকূল জলবায়ু, উর্বর পলিমাটি, বিস্তীর্ণ সমভূমি

খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য

কয়লা, আকরিক লোহা, তামা, দস্তা, টাংস্টেন প্রভৃতি।

- উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা
- পর্যাপ্ত জলসম্পদ
- সাংহাই, নানকিং, চুংকিং বন্দরের অবস্থান
- ঘনবসতি, সুলভ শ্রমিক
- উন্নত পরিকাঠামো

শিল্পের উন্নতি

লৌহ ইস্পাত, রাসায়নিক, যন্ত্রপাতি নির্মাণ, রেশম ও বস্ত্রবয়ন শিল্প।

জাপানের টোকিয়ো-ইয়োকোহামা শিল্পাঞ্চল

জাপানের প্রধান চারটি দ্বীপের বৃহত্তম দ্বীপ হলো হনসু। হনসুর পূর্বাংশে অবস্থিত কান্টো সমভূমি গঠিত সাতটি আঞ্চলিক বিভাগ নিয়ে। এগুলো হলো— গানমা, তোচিগি, ইবারকি, সাইতামা, টোকিয়ো, চিবা এবং কানাগাওয়া। এই সমভূমির জনবসতি অত্যন্ত ঘন। গোটা জাপানের ৩ ভাগের ১ ভাগ লোক এই অঞ্চলে বসবাস করে। টোকিয়ো উপসাগরকে কেন্দ্র করে এই সমভূমি বিস্তার লাভ করেছে। টোকিয়ো উপসাগরের ধারে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু বড়ো শহর যেমন- টোকিয়ো, ইয়োকোহামা, কাওয়াসাকি, চিবা। এই শহরগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো সমুদ্র সান্নিধ্য। সমুদ্রের ধারে অবস্থিত হওয়ায় শহরগুলোর প্রত্যেকটিতে বন্দর আছে। বন্দরগুলো জাপান তথা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে বন্দরগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বন্দরগুলোর ওপর নির্ভর করে কান্টো সমভূমিতে গড়ে উঠেছে জাপানের শ্রেষ্ঠ শিল্প এলাকা— **কিহিন শিল্পাঞ্চল বা টোকিয়ো-ইয়োকোহামা শিল্পাঞ্চল।**

টোকিয়ো-ইয়োকোহামা শিল্পাঞ্চল

টোকিয়ো: জাপানের রাজধানী টোকিয়ো একদিকে যেমন জাপানের বৃহত্তম শহর, বন্দর এবং বৃহত্তম শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র, তেমনি অন্যদিকে জাপানের শিক্ষা-সংস্কৃতির পীঠস্থান।

ইয়োকোহামা: হনসু দ্বীপের দক্ষিণ দিকে, টোকিয়ো থেকে প্রায় ৩০ কিমি. দূরত্বে অবস্থান করছে ইয়োকোহামা। জাপানের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর, ইয়োকোহোমা জাপানের সর্ববৃহৎ বন্দর। টোকিয়ো বন্দরের কাছে উপসাগরের গভীরতা কম তাই বড়ো বড়ো জাহাজ এই টোকিয়ো বন্দরে প্রবেশ করতে পারে না। ইয়োকোহামা এই দেশের বৃহত্তম বহির্বন্দর হিসাবে কাজ করে।

টোকিয়ো - ইয়োকোহামা শিল্পাঞ্চলের শিল্প

- কার্পাস বস্ত্রবয়ন
- পশম
- কাগজ
- খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ
- জৈব প্রযুক্তি

- লৌহ-ইস্পাত
- মোটর গাড়ি
- বিমান নির্মাণ
- ইলেকট্রনিকস্
- তথ্যপ্রযুক্তি

টোকিয়োর সমস্যা

- অত্যন্ত জনবহুলতা
- জমির অভাব
- সীমাবদ্ধ পরিবহন
- পরিবেশ দূষণ

সমাধানের পথ

- কারখানাগুলো অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। বিশেষত চিবা, ইবারাকি শহরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছে জাপান সরকার।

ইয়োকোহামার বিশেষ বৈশিষ্ট্য

- গোটা বিশ্বকে নগর পরিকল্পনার ব্যাপারে নতুন দিশা দেখিয়েছে এই শহর।
- জাপান সরকার কর্তৃক (২০০৮ সালে) আদর্শ **পরিবেশ-বান্ধব শহর** হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।
- শিল্প-দূষণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছে।
- শিল্পের পাশাপাশি কৃষিকাজকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
- বর্জ্য পদার্থের সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং পুনর্ব্যবহার করা হচ্ছে।
- পতিত জমি পুনরুদ্ধার এবং জমির পুনর্বিন্যাসের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বলতে পারো?

- কিহিন শিল্পাঞ্চল বা টোকিয়ো-ইয়োকোহামা শিল্পাঞ্চল জাপানের শ্রেষ্ঠ তথা পৃথিবীর এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল হিসেবে গড়ে ওঠার কারণগুলো কী?
- একটা শিল্পাঞ্চলে কী কী সমস্যা হতে পারে?
- শিল্পাঞ্চলের সমস্যা সমাধান কী ভাবে করা যেতে পারে?

দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার তৈল বলয়

খনিজ তেল উত্তোলনে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলো পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। সারা পৃথিবীতে যত পরিমাণ খনিজ তেল সঞ্চিত আছে তার ৬০ শতাংশই আছে এই অঞ্চলে। পৃথিবীর মোট খনিজ তেল উত্তোলনের প্রায় ৩০ শতাংশই এই অঞ্চলে উত্তোলিত হয়। এখানকার প্রধান খনিজতেল উত্তোলনকারী দেশগুলো হলো সৌদি আরব, ইরাক, ইরান, কুয়েত, বাহরিন ইত্যাদি। সৌদি আরব, পৃথিবীর বৃহত্তম উপদ্বীপ, আরব উপদ্বীপের বৃহত্তম রাষ্ট্র। উষ্ণ মরুভূমি প্রধান সৌদি আরবে পৃথিবীর ২৬ শতাংশ খনিজ তেল সঞ্চিত আছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার জনবসতি কম। তাই খনিজ তেলের চাহিদাও বেশি নয়। সেই কারণে, যে পরিমাণ খনিজ তেল উৎপাদন হয়। তার বেশির ভাগটাই রপ্তানি করা হয়।

আধুনিক যন্ত্র নির্ভর সভ্যতা খনিজ তেলের উপর নির্ভরশীল। যানবাহন চালাতে, বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে, কারখানার যন্ত্রপাতি সচল রাখতে খনিজ তেল অপরিহার্য। তাছাড়া প্লাস্টিক, কৃত্রিম রবার, রং, কৃত্রিম তন্তু এধরনের বহু জিনিস তৈরিতে খনিজ তেল ব্যবহার করা হয়।

বিশ্বের বাজারে খনিজ তেলের দাম কত হবে, কোন দেশ কত পরিমাণ খনিজ তেল বিদেশে বিক্রি করবে— সবটাই ঠিক করে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি। এই দেশগুলি OPEC (ওপেক) -এর সদস্য। OPEC এর পুরো নাম হলো Organisation of Petroleum Exporting Countries । (অরগ্যানাইজেশন অব পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রি)

খনিজ তেল উত্তোলক অঞ্চল

খনিজ তেল উত্তোলক দেশ	তৈলখনি
১. সৌদি আরব	ঘাওয়ার, আবকিক, আইনডার, ধাহরান, সাফানিয়া, মনিফা।
২. ইরান	মসজিদ-ই-সুলেমান, নফত-ই-শাহ, আঘাজারি, হাফাতকেল, গাচসারন, লালি।
৩. ইরাক	কিরকুক, মাসুল।
৪. কুয়েত	বারগান, মগওয়া-আল হামাদি, আলজারা
৫. সংযুক্ত আরব আমিরশাহি	মুরবান আমিরশাহি
৬. কাতার	জেবেল দুখান, ইদ-আল শারখি।
৭. ওমান	নাতিহ্।
৮. সিরিয়া	ওমর, আল-ইজবা।

এই সমস্ত তেল উত্তোলনকারী দেশগুলোর অর্থনীতি রপ্তানি নির্ভর। খনিজ তেলের মতো মূল্যবান জিনিস উৎপাদন করে এসব দেশে বসবাসকারী মানুষ বিলাসবহুল জীবন যাপন করে।

দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার এই দেশগুলোর আবহাওয়া ভীষণ শুষ্ক আর উষ্ণ। একসময় খুব কম লোক বসবাস করত। খনিজ তেলের বিরাট ভাণ্ডার আবিষ্কার হওয়ার পর এখানে বড়ো বড়ো তৈলখনিকেন্দ্রিক শহর গড়ে উঠেছে।

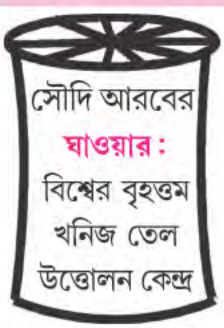

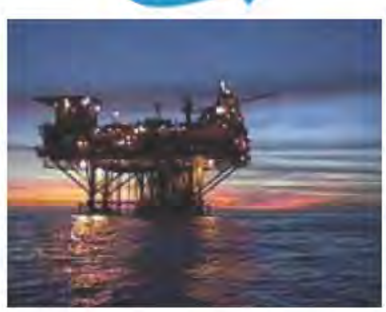

আফ্রিকা : রাজনৈতিক

উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর
মরক্কো
আ ল জি রি য়া
টিউনিসিয়া
ত্রিপোলি
লি বি য়া
মি শ র
এ শি য়া
পশ্চিম সাহারা
মৌ রি তা নি য়া
মা লি
না ই জা র
চা দ
সু দা ন
ইরিত্রিয়া
গি নি
বুরকিনা ফাসো
আইভরি কোস্ট
ঘানা
বেনিন
নাইজিরিয়া
লাইবেরিয়া
সিয়েরা লিওন
ক্যামেরুন
মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র
দ ক্ষি ণ সু দা ন
ই থি ও পি য়া
সোমালি প্রজাতন্ত্র
নিরক্ষীয় গিনি
সাও টোম ও প্রিন্সিপে
গ্যাবোন
কঙ্গো
উগান্ডা
কে নি য়া
গ ণ প্র জা ত ন্ত্রী
ক ঙ্গো
তা ন জা নি য়া
ভা র ত
ম হা সা গ র
অ্যা ঙ্গো লা
জা ম্বি য়া
দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগর
মোজাম্বিক
মাদাগাস্কার
জিম্বাবোয়ে
না মি বি য়া
বো ৎ স ও য়া না
সোয়াজিল্যান্ড
দ ক্ষি ণ আ ফ্রি কা

১০ আফ্রিকা মহাদেশ

কঙ্গো নদী

জীববৈচিত্র্য

মিশরের পিরামিড

ড্রাকেন্সবার্গ পর্বতমালা

আফ্রিকার ভেল্ড

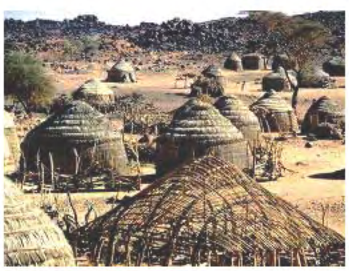

জনবসতি

নীলনদ

সংস্কৃতি

সাহারা মরুভূমি

মাসাইমারা

সাভানায় সূর্যাস্ত

● আয়তনে এবং জনসংখ্যায় পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ আফ্রিকা, একই সঙ্গে পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম গোলার্ধে অবস্থিত।

● নিরক্ষরেখা, কর্কটক্রান্তিরেখা, মকরক্রান্তিরেখা এবং মূলমধ্যরেখা-চারটিই আফ্রিকার ওপর দিয়ে বিস্তৃত হয়েছে।

● পূর্ব আফ্রিকাতেই পৃথিবীর প্রথম মানুষের উদ্ভব হয়েছিল।

● ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আফ্রিকার বহু দেশ ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার কিছু দেশের উপনিবেশ ছিল।

● ইউরোপ মহাদেশ আর আফ্রিকা মহাদেশের মাঝে আছে জিব্রাল্টার প্রণালী। এশিয়া মহাদেশ আর আফ্রিকার মাঝে আছে লোহিত সাগর ও সুয়েজ খাল। **দুটি বড়ো জলভাগ যেমন সাগর বা মহাসাগর, যুক্ত হয় যে সংকীর্ণ জলভাগ দ্বারা তা হলো প্রণালী।**

আফ্রিকার অবস্থান ও সীমা

● প্রাকৃতিক দুর্গমতা, অস্বস্তিকর উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু, গভীর জঙ্গল ও হিংস্র জন্তুর ভয় ইত্যাদি কারণের জন্য বহুদিন পর্যন্ত এই মহাদেশে আধুনিক সভ্যতার আলো এসে পৌঁছাতে পারেনি, এইজন্য এই মহাদেশকে **অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ** বলা হতো।

পিকলুর ডায়েরি

● **আয়তন:** ৩,০২,২১,৫৩২ বর্গ কিমি.

● **সীমা ও বিস্তার:** ৫১°২৪′ পূঃ দ্রাঃ—১৭°৩৩′ পঃ দ্রাঃ এবং ৩৭°২০′ উঃ অঃ—৩৪°৫২′ দঃ অঃ

পূর্বে লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর, উত্তরে ভূমধ্যসাগর এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগর।

● **দেশ:** ৫৬টি

● **বিখ্যাত শহর:** কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া, ত্রিপলী, খার্টুম ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক পরিবেশ

ভূমিরূপের বৈচিত্র্য

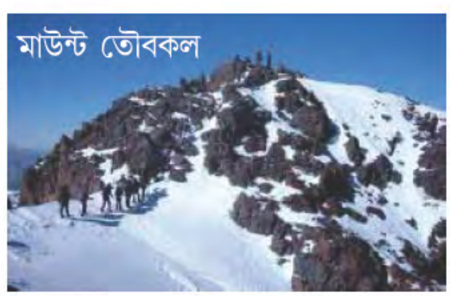

আফ্রিকা মহাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্রটার দিকে তাকালে একেবারে উত্তর-পশ্চিম দিকে আটলাস পর্বতমালা দেখা যাবে। আটলাস হিমালয় পর্বতমালার মতো উঁচু বা বিশাল নয়। **আটলাস পর্বতমালার সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গ হলো মাউন্ট তৌবকল** (৪,১৬৫মি.)।

আটলাস পর্বতমালার দক্ষিণ দিকে রয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি অঞ্চল— সাহারা। সাহারা মরুভূমির মধ্যভাগে আহাগ্গার ও টিবেস্টি মালভূমি দেখা যায়। অত্যন্ত শুষ্ক ও রুক্ষ হওয়ায় এখানে বসতি প্রায় দেখাই যায় না।

সাহারা মরুভূমির পূর্ব প্রান্তে আছে নীলনদ অববাহিকা। এই নদী আফ্রিকার মধ্যভাগের হ্রদ অঞ্চল থেকে বিপুল জলরাশি বয়ে নিয়ে এসে মিশরের মরুঅঞ্চলকে সবুজ করে তুলেছে।

নিরক্ষরেখার আশেপাশে দেখা যায় কঙ্গো নদী অববাহিকার ঘন জঙ্গল। বৃষ্টি বেশি হওয়ায় এই জঙ্গল সারাবছর সবুজ থাকে।

পূর্ব আফ্রিকার ভূ-প্রকৃতি একটু অন্যরকম। ভূ-আলোড়নের ফলে ভূ-পৃষ্ঠে ফাটল তৈরি হয়েছে। দুটো ফাটলের মাঝের অংশ নীচের দিকে বসে গিয়ে তৈরি করেছে গ্রস্ত উপত্যকা (Great Rift valley)। গ্রস্ত উপত্যকা অঞ্চলে বহু হ্রদ দেখা যায়। হ্রদগুলোর দৈর্ঘ্য ও গভীরতা অনেক বেশি। টাঙ্গানিকা, মালাউই, রুডল্ফ, অ্যালবার্ট এগুলো সবই এই রকম হ্রদ।

পূর্ব আফ্রিকায় গ্রস্ত উপত্যকা অঞ্চল ছাড়াও রয়েছে ইথিওপিয়ার উচ্চভূমি। এই উচ্চভূমি দক্ষিণে মাউন্ট কেনিয়া, মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো এবং রুয়েঞ্জুরি পর্বত পর্যন্ত চলে গেছে। **মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো (৫,৮৯৫ মি.) আফ্রিকা মহাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। নিরক্ষরেখার কাছাকাছি অবস্থিত হলেও উচ্চতা অনেক বেশি হওয়ায় সারাবছর এর চূড়ায় বরফ জমে থাকে।**

কালাহারি আর নামিব নামে দুটি মরুভূমি দক্ষিণ আফ্রিকায় রয়েছে। উঁচু মালভূমিতে যে তৃণাঞ্চল আছে তার নাম **ভেল্ড**। একেবারে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রয়েছে ড্রাকেন্সবার্গ পর্বতমালা।

- **আফ্রিকার মানচিত্রে চিহ্নিত করে দেখাও :**

আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, ভূমধ্য সাগরচ,লোহিত সাগর, জিব্রাল্টার প্রণালী, নিরক্ষরেখা, কর্কটক্রান্তিরেখা,মকরক্রান্তিরেখা, মূলমধ্যরেখা,আটলাস পর্বতমালা, ড্রাকেন্সবার্গ পর্বতমালা, সাহারা মরুভূমি, আহাগ্গার ও টিবেস্টি মালভূমি, নীলনদ অববাহিকা, মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো, কালাহারি ও নামিব মরুভূমির অবস্থান সম্পর্কে ধারণা দাও।

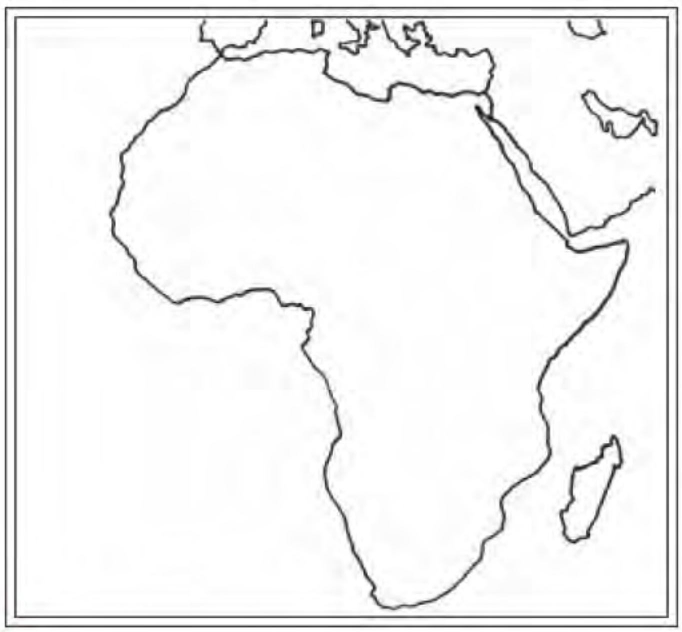

২। মেলাও তো দেখি :

(ক) ভেল্ড	(ক) আটলাস পর্বতমালা
(খ) কঙ্গো নদী অববাহিকা	(খ) দক্ষিণ আফ্রিকার তৃণ অঞ্চল
(গ) সাহারা	(গ) দুটি ফাটলের মধ্যবর্তী নীচু অংশ
(ঘ) মাউন্ট তৌবকল	(ঘ) ঘন জঙ্গল (চিরসবুজ)
(ঙ) গ্রস্ত উপত্যকা	(ঙ) প্রায় বসতিহীন অঞ্চল।

৩। বলতে পারো কেন?....

৩.১ সাহারা মরুভূমিতে জনবসতি প্রায় দেখাই যায় না।

৩.২ নীলনদ মিশরের মরু অঞ্চলকে সবুজ করে তুলেছে।

৩.৩ কঙ্গো নদীর অববাহিকার ঘন জঙ্গল সারাবছর সবুজ থাকে।

৩.৪ পূর্ব আফ্রিকায় গ্রস্ত উপত্যকা সৃষ্টি হয়েছে।

নদ নদী

আফ্রিকা মহাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্রে বহু উচ্চভূমি, মালভূমি ও হ্রদ এলাকা দেখা যায়। এই উচ্চভূমি আর হ্রদগুলোই হচ্ছে আফ্রিকার বড়ো বড়ো নদীর উৎস অঞ্চল। আফ্রিকার পাঁচটা বড়ো নদী হলো —

নদী	দৈর্ঘ্য
(১) নীলনদ	৬৬৫০ কিমি
(২) কঙ্গো নদী	৪৭০০ কিমি
(৩) নাইজার নদী	৪১৮০ কিমি
(৪) জাম্বেসি নদী	৩৫৪০ কিমি
(৫) অরেঞ্জ নদী	২২০০ কিমি

(১) নীলনদ : শুধু আফ্রিকার নয়, সারা পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী নীলনদ। আফ্রিকার মোট জলপ্রবাহের প্রায় ১০ ভাগ জলই নীল নদ দিয়ে বয়ে যায়। দুটো প্রধান ধারা এই নদী তৈরি করেছে। একটা হলো হোয়াইট নীল, যার উৎস আফ্রিকার বিখ্যাত বুরুন্ডি মালভূমি। অন্য ধারাটা হলো ব্লু নীল, যার উৎস ইথিওপিয়ার উচ্চভূমি। উত্তর সুদানের রাজধানী খার্তুম শহর হলো এই দুই ধারার মিলনস্থল। নীলনদ উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়ে সাহারা মরুভূমির পূর্বপ্রান্তকে করে তুলেছ সবুজ। নীলনদ ভূমধ্যসাগরে, মোহনার কাছে তৈরি করেছে বিশাল ব-দ্বীপ। মিশরের অধিকাংশ মানুষ নীলনদের ধারে কৃষিকাজ, পশুপালন ও বসবাস করে। খার্টুম, আসোয়ান, লাস্কার, কায়রো হলো নীলনদের ধারে গড়ে ওঠা বিখ্যাত শহর।

(২) কঙ্গো নদী : আফ্রিকার দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী। এর প্রবাহের দিক পশ্চিম দিকে। দৈর্ঘ্যে নীলনদের চেয়ে কম হলেও জলপ্রবাহ যথেষ্ট বেশি। আফ্রিকার সবচেয়ে বৃষ্টিবহুল এলাকা থেকে কঙ্গোর সৃষ্টি। প্রতিদিন প্রচুর জল কঙ্গোর মধ্যে দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে পড়ে। বয়ে যাওয়ার পথে বহু জায়গায় গভীর উপত্যকা তৈরি করেছে। জাম্বিয়ার উত্তরপ্রান্ত হলো এই নদীর উৎসস্থল। প্রায় ওই একই জায়গা থেকে পূর্ব দিকে সৃষ্টি হয়েছে জাম্বেসি নদী। কিসাঙ্গানি, বানডাকা, কিনশাসা, ব্রাজাভিল হলো কঙ্গোর তীরে গড়ে ওঠা বড়ো শহর।

(৩) নাইজার নদী : পশ্চিম আফ্রিকার প্রধান নদী। এর উৎসস্থল আটলান্টিক মহাসাগর থেকে মাত্র ২০০ কিমি. দূরে, গিনি উচ্চভূমিতে। মানচিত্রটি দেখলে দেখা যাবে নদীটা আটলান্টিকের উল্টো দিকে সাহারা মরুভূমির দিকে প্রবাহিত হয়েছে। উত্তরদিকে টিমবাক্টু শহর পর্যন্ত প্রবাহিত হওয়ার পর আবার দক্ষিণ দিকে এসে নাইজেরিয়ায় প্রবেশ করেছে। মোহনার কাছে ব-দ্বীপ তৈরি করেছে, যা বেশ জনবহুল। এখানে চাষাবাদ, পশুপালন মানুষের জীবিকা। এই নদী ব-দ্বীপের জলাভূমিতে প্রতিবছর পরিযায়ী পাখি উড়ে আসে।

(৪) জাম্বেসি নদী : আফ্রিকার চতুর্থ দীর্ঘতম নদী। জাম্বিয়া, অ্যাঙ্গোলা আর কঙ্গো এই তিনটি দেশের সীমান্ত অঞ্চলে সেইখান থেকেই এই নদীর উৎপত্তি। এই নদীর পথে সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবী বিখ্যাত **ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত**। দুটো বড়ো জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হয়েছে এই নদী পথে।

(৫) অরেঞ্জ নদী : পশ্চিম দিকে প্রবাহিত। আফ্রিকার পঞ্চম দীর্ঘতম নদী। ড্রাকেন্সবার্গ পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে আটলান্টিকে পড়েছে অরেঞ্জ নদী। বেশ কয়েকটা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। জলসেচের উদ্দেশ্যে প্রায় ২৯ টা জলাধার তৈরি করা হয়েছে এই নদীতে।

ঠিক ঠিক লিখে ফেলো...

নদীর নাম	নদীর দৈর্ঘ্য (কিমি)	নদীর উৎস	নদীর মোহনা	নদীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য
নীল নদ				
কঙ্গো নদী				
নাইজার নদী				
জাম্বেসি নদী				
অরেঞ্জ নদী				

আফ্রিকার জলবায়ু

আফ্রিকার ভূমিরূপের বৈচিত্র্য জানা হলো। নদনদীর সম্পর্কেও জানা গেল। এবার জানব এই মহাদেশের জলবায়ু কেমন। এখানকার জলবায়ু সবজায়গায় সমান নয়। সমুদ্রের ধারের জলবায়ু একরকম তো, সমুদ্র থেকে দূরে আরেকরকম। সমভূমিতে একরকম তো পাহাড়ের ওপরে আরেকরকম।

আফ্রিকা মহাদেশে জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের বৈচিত্র্যের কারণ

অক্ষরেখা

নিরক্ষরেখার কাছাকাছি উষ্ণতা বেশি অনুভূত হয়। নিরক্ষরেখা থেকে যত মেরুর দিকে যাওয়া যায়, সূর্যের তির্যক রশ্মির কারণে উষ্ণতা তত কমে যায়।

আফ্রিকার প্রায় মাঝখান দিয়ে নিরক্ষরেখা গেছে। **তাহলে আফ্রিকা মহাদেশের ক্ষেত্রে অক্ষরেখার অবস্থান জলবায়ুর ওপর কী ভাবে প্রভাব ফেলবে?**

সমুদ্র থেকে দূরত্ব

সমুদ্রের পাশের স্থলভূমির উষ্ণতাকে সমুদ্রের বাতাস খুব বাড়তে বা কমতে দেয় না। স্থলভূমি যত সমুদ্র থেকে দূরে হয় সেখানে ঠান্ডা ও গরমের পার্থক্য বাড়ে।

আফ্রিকা মহাদেশের সমুদ্র উপকূল ও উপকূল থেকে দূরে সমুদ্রের প্রভাব কী ভাবে পড়বে?

সমুদ্রস্রোত

সমুদ্রের মধ্যে যে বিপুল জলরাশি স্রোতের মতো বয়ে চলে, তা হলো সমুদ্র স্রোত। সমুদ্রস্রোত উষ্ণ বা শীতল দু-ই হতে পারে।

আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দিক দিয়ে উষ্ণ বা শীতল সমুদ্রস্রোত প্রবাহিত হয়। **এইসব উপকূল অঞ্চলে সমুদ্রস্রোতের প্রভাব কী?**

উচ্চতা

উচ্চতা বাড়লে বাতাসের উষ্ণতা কমে যায়। প্রতি ১ কিমি উচ্চতা বাড়লে বাতাসের উষ্ণতা গড়ে ৬.৪° সে. হারে কমে।

আফ্রিকার উঁচু পার্বত্য এলাকায় বাতাসের উষ্ণতার ওপর উচ্চতার প্রভাব কী?

উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুব সহজেই খুঁজে ফেলা যায়।

ভেবে দেখো ....

■ একই সময়ে আফ্রিকার উত্তরভাগ আর দক্ষিণ ভাগের জলবায়ু একরকম হয় না কেন?

■ আফ্রিকার ক্রান্তীয় অঞ্চলে সাহারার মতো বড়ো মরুভূমির সৃষ্টি হলো কেন?

■ আফ্রিকার কিলিমাঞ্জারো পর্বত নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তার চূড়ায় সারাবছর বরফ জমে থাকতে দেখা যায় কেন?

জলবায়ুর সঙ্গে স্বাভাবিক উদ্ভিদের সম্পর্ক

রফিক গরমের ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছিল। পনেরো দিন বাড়িতে তালা। ফিরে দেখে টবের গাছগুলো জল না পেয়ে শুকিয়ে কাঠ। রফিকের চোখ জলে ভরে এল। নিজের হাতে গাছগুলো লাগিয়েছিল। শুধু বেঁচে আছে ক্যাকটাস গাছটা! রফিক বুঝলো জলের অভাবেও কিছু গাছ বাঁচে।

আফ্রিকা মহাদেশের জলবায়ু সব জায়গায় সমান নয়। বিশেষ করে তাপমাত্রা আর বৃষ্টিপাতের ওপর গাছপালা জন্মানো, বেড়ে ওঠা নির্ভর করে। তাপমাত্রা, বৃষ্টির পরিমাণ বদলালে গাছপালার ধরন বদলে যায়। তাহলে দেখা যাক আফ্রিকা মহাদেশে কোথায় কেমন গাছপালা জন্মায় —

১. নিরক্ষীয় চিরসবুজ গাছের অরণ্য : নিরক্ষরেখার কাছাকাছি অঞ্চলে সারাবছর গরম (২৭°সে.), মোট বৃষ্টির পরিমাণ, ২০০-২৫০ সেমি.। সরাসরি সূর্যকিরণ আর সারা বছর বৃষ্টিতে এখানে শক্ত কাঠের ঘন জঙ্গল সৃষ্টি হয়েছে। মেহগনি, রোজউড, এবনি এই ঘন জঙ্গলের প্রধান গাছ। পাতা ঝরানোর নির্দিষ্ট ঋতু না থাকায় গাছগুলো সারাবছর সবুজ দেখায়। তাই এর নাম চিরসবুজ গাছের অরণ্য।

মেহগনি গাছ

অ্যাকাসিয়া গাছ

২. সাভানা তৃণভূমি : নিরক্ষীয় অঞ্চলের উত্তরে আর দক্ষিণে বৃষ্টি কমে যেতে থাকে। গরমকালের দৈর্ঘ্য বাড়ে আর বৃষ্টি হয় বছরে ১৫০ সেমির মতো। মরুভূমির দিকে বৃষ্টি কমে ২৫ সেমির মতো হয়ে যায়। মোটামুটি গরম আর কম বৃষ্টির জন্য বড়ো গাছের সংখ্যা কম। তার বদলে লম্বা ঘাসের প্রান্তর চোখে পড়ে। দিগন্ত বিস্তৃত ঘাসজমির মধ্যে অ্যাকাসিয়া আর বাওবাব জাতীয় গাছ দেখা যায়।

জলপাই গাছ

৩. ভূমধ্যসাগরীয় উদ্ভিদ : আফ্রিকার একেবারে উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু দেখা যায়। এই জলবায়ু অঞ্চলে শীতকালে বৃষ্টি হয়। সারা বছরে ৫০-১০০ সেমি. বৃষ্টি হয়। গরমকাল বৃষ্টিহীন থাকে। পাতায় নরম মোমের আস্তরণ দেখা যায়। জলপাই, ওক, আখরোট, ডুমুর, কর্ক, গাছগুলো এখানে জন্মায়। গরমকালে জলের সন্ধানে গাছের মূলগুলো অনেক গভীরে চলে যায়। কমলালেবু, আঙুর এইসব ফলের বাগান খুব চোখে পড়ে।

মরূদ্যান

৪. উষ্ণমরু উদ্ভিদ : সাহারা, কালাহারি, নামিব এই মরুভূমিগুলোতে বৃষ্টি হয় না বললেই চলে। দিনের তাপমাত্রা ভীষণ বেশি। রাতের তাপমাত্রা সেই তুলনায় অনেক কম। কাঁটাগাছ, ঝোপ-ঝাড়, ঘাস দেখা যায়। গাছগুলো নিজের শরীরে জল ধরে রাখে নানাভাবে। তাই অতি গরমেও গাছগুলো বেঁচে থাকে। মরুভূমির মধ্যে মরূদ্যান দেখা যায়। মরূদ্যানের ধারে খেজুর, তাল জাতীয় গাছের সারি চোখে পড়ে।

৫. নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি বা ভেল্ড : আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ দিকে কালাহারি মরুভূমি আর ভারত মহাসাগরের ধারে উপকূল অঞ্চলে শীতকালে বেশ ঠান্ডা পড়ে। গরমকালে মোটামুটি গরম। শীত গ্রীষ্মের তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি। এখানে মরু অঞ্চলের থেকে একটু বেশি বৃষ্টি হয়। উঁচু পাহাড়ের ঢালে পপলার, উইলো এই সব গাছ দেখা যায়। সমভূমি এলাকায় ছোটো, খসখসে সবুজ ঘাস দেখা যায়। এই তৃণভূমিকে বলে **ভেল্ড**।

ভেল্ড

৬. মৌসুমি পর্ণমোচী গাছের অরণ্য : আফ্রিকার একেবারে পূর্বদিকে আর মাদাগাস্কার দ্বীপে গরমকালে বৃষ্টি হয়। শীতকাল শুষ্ক থাকে। তবে তাপমাত্রা কোনো ঋতুতেই খুব বেশি নয়। শাল ও বাঁশ গাছের বন জঙ্গল দেখা যায়। শীতকালে জলের অভাবে গাছের পাতা ঝরে যায়।

৭. পূর্ব উপকূলীয় উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ বা চিন দেশীয় উদ্ভিদ : দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল অঞ্চলে গরমকালে বেশ গরম আর বৃষ্টিও হয়। চিন দেশের পূর্বাংশে একই জলবায়ু দেখা যায়, তাই এর নাম চিনদেশীয় জলবায়ু। পাতাঝরা গাছ দেখা যায়। ওক গাছ বেশি চোখে পড়ে।

বলোতো দেখি

- কোন গাছ কোন জলবায়ু অঞ্চলে জন্মায়

গাছ বা গাছের ধর্ম	জলবায়ু অঞ্চল
কাঁটাগাছ	
পাতায় মোমের আস্তরণ	
শাল ও বাঁশ গাছ	
জলপাই গাছ	
খসখসে সবুজ ঘাস	
সবুজ ঘাসের সঙ্গে বাওবাব জাতীয় মরু উদ্ভিদ	

- ছোটো ছোটো কাগজে আফ্রিকার ভূ-প্রকৃতি, নদনদী, জলবায়ু আর স্বাভাবিক উদ্ভিদ সম্পর্কে লেখো। যেমন একটা কাগজে লিখলে 'সাহারা'। এরকম আরও টুকরো কাগজে লিখে ফেলো। সবাই একটা একটা করে ভাঁজ করা কাগজ তোলো। খুলে দেখো, তোমার কী বিষয় পড়েছে। দু-মিনিট কিংবা তিন মিনিট সময়ে বিষয়টা নিয়ে যা জান বলো।

নীলনদ অববাহিকা

নীলনদের ধারে গড়ে ওঠা প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার কথা আমরা জানি। সভ্যতা গড়ে ওঠার জন্য জলের যোগান থাকাটা ভীষণ জরুরি। সেই কারণেই প্রাচীন মানব সভ্যতাগুলোর বেশিভাগই নদী কেন্দ্রিক।

নীলনদ অববাহিকা আফ্রিকা মহাদেশের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। মিশর দেশটি নীলনদ দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত। নীলনদ যদি না থাকতো তাহলে মিশর সাহারা মরুভূমির অংশ হয়ে যেত। কৃষি, পশুপালন, জলসেচ, জলবিদ্যুৎ, পরিবহন, শিল্পোন্নতি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে নীলনদের অবদান অপরিসীম। এককথায় মিশরের যা কিছু সমৃদ্ধি তা নীলনদের জন্যই। তাই মিশর হলো **নীলনদের দান**।

নীলনদের প্রবাহ পথটা কেমন ?

নীলনদের মানচিত্র থেকে বোঝা যায় **নীলনদে** সারাবছর জল থাকে। নীলনদে সারাবছর জলপ্রবাহ কোথা থেকে আসে? নীলনদে বন্যা হয়। **তার কারণ কী ?**

হোয়াইট নীলের উৎস	ব্লু নীলের উৎস
↓	↓
বুরুন্ডি মালভূমি ও ভিক্টোরিয়া হ্রদ	ইথিওপিয়ার উচ্চভূমির টানা হ্রদ
↓	↓
নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল	মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চল
↓	↓
সারাবছর বৃষ্টি	গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টি
↓	↓
নীলনদে সারাবছর জল	নীলনদে বাড়তি জল

↓

নীলনদের নিম্ন অংশে বন্যা (জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে)

↓

বন্যার ফলে নদীর দুই তীরে নতুন পলিসঞ্চয়

↓

উর্বর কৃষি জমি

নীলনদ অববাহিকা

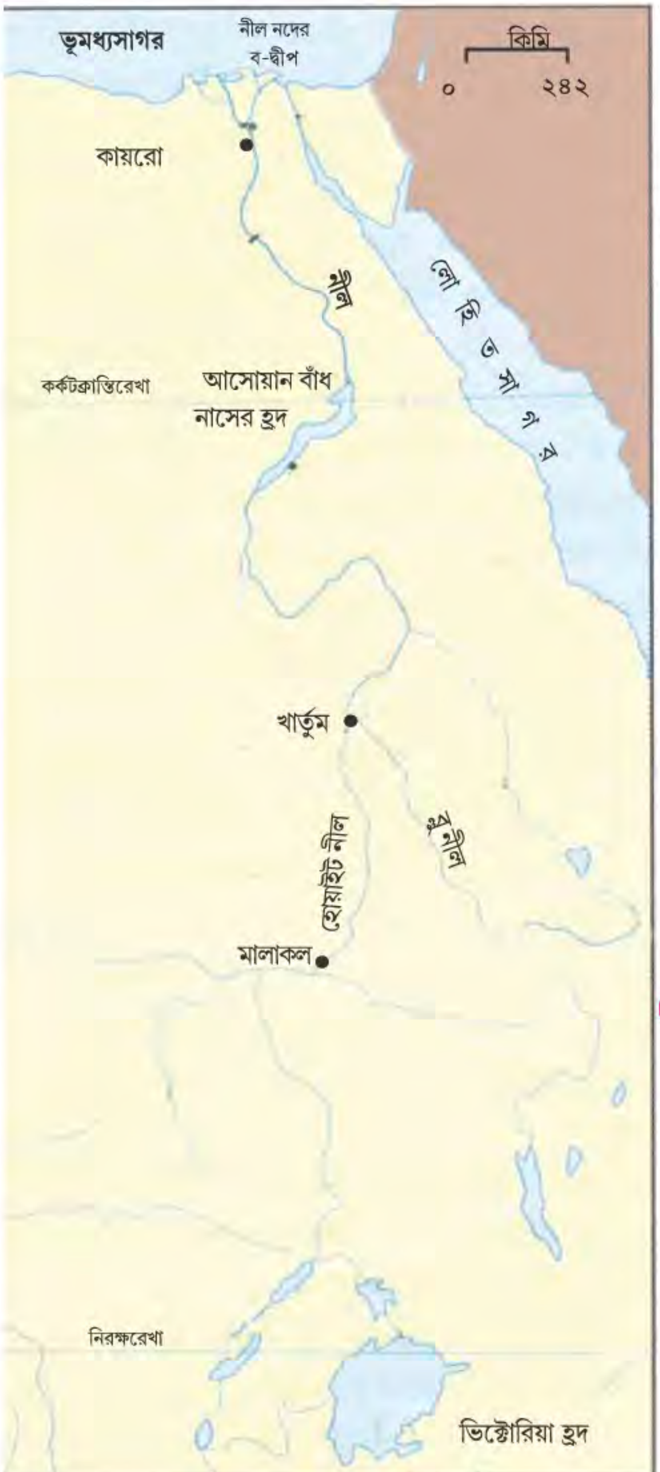

(৫) ব-দ্বীপ অঞ্চল

কায়রো থেকে ভু-মধ্যসাগর। উর্বর পলি সমৃদ্ধ কৃষি এলাকা।

(৪) অববাহিকার নিম্ন অংশ

আসোয়ান থেকে কায়রো। ছ'টি ধাপে নদীটি নেমে গেছে, তৈরি করেছে ছ'টি জলপ্রপাত।

(৩) মধ্য অববাহিকা

মালাকল থেকে খার্তুম। অসমতল, সাভানা তৃণ ভূমি দেখা যায়।

(২) অববাহিকার উচ্চ অংশ

ভিক্টোরিয়া হ্রদ থেকে সুদানের মালাকল শহর।

(১) নদীর উৎস অঞ্চল

তাঞ্জানিয়া দেশের বুরুন্ডি মালভূমি অঞ্চল।

অ ব বা হি কা র বি ভি ন্ন অং শ

নতুন পলি পড়া উর্বর মাটিতে গম, বার্লি, ধান, আখ, মিলেট প্রভৃতি ফসলের চাষ হয়। নীলনদের ব-দ্বীপ অঞ্চলে প্রচুর লম্বা আঁশের তুলোর চাষ হয়। সারা বিশ্ব জুড়ে যা **ইজিপসিয়ান কটন** নামে খ্যাত।

নীলনদের অববাহিকায় উৎপাদিত ফসল

অঞ্চল	উৎপাদিত ফসল
উচ্চ অববাহিকা	কফি, কলা, তামাক ইত্যাদি
মধ্য অববাহিকা	গম, খেজুর, জোয়ার, চিনেবাদাম ইত্যাদি
নিম্ন অববাহিকা	জলপাই, যব, ভুট্টা ইত্যাদি
ব-দ্বীপ অঞ্চল	ধান, গম, তুলো ইত্যাদি

বন্যার জলের সাথে নতুন পলি এসে মাটিতে মেশে। কিন্তু বন্যার ফলে ঘর-বাড়ি ধসে পড়ে, চাষের জমিতে ফসল নষ্ট হয়। গোরু, ছাগল মারা যায়। সম্পত্তি নষ্ট হয়।

তাহলে বন্যার অতিরিক্ত জলকে আটকাবার জন্য কী উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে ?

রাজর্ষি বলল, নদীতে বাঁধ দিয়ে অতিরিক্ত জল আটকে রাখা যেতে পারে। বাঁধের জল প্রয়োজন মতো ছাড়া হয়। রাজর্ষি মাইথন জলাধার (Dam) দেখেছে। পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ড সীমান্তে বরাকর নদীতে বাঁধ তৈরি করা হয়েছে। নীলনদের ওপরও মিশরীয়রা বাঁধ তৈরি করেছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও কৃষি জমিতে জলসেচ এই দুটি মূল উদ্দেশ্যে নীলনদের ওপর আসোয়ান বাঁধ তৈরি করা হয়েছে। তবে নদী বাঁধ নির্মাণের আরও অনেক উদ্দেশ্য থাকে। যখন বহু উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নদীতে বাঁধ তৈরি করা হয় তখন তাকে বলে **বহুমুখী নদী পরিকল্পনা**। নীলনদের ওপর এরকম অনেক **নদী পরিকল্পনা** করা হয়েছে।

পৃথিবীর বৃহত্তম বাঁধ → **উচ্চ আসোয়ান বাঁধ** (মিশর)। ব্লু নীলের ওপর তৈরি হয়েছে **জেবেল-আউলিয়া** বাঁধ। সুদানে ব্লু নীলের ওপর দেওয়া আছে **সেনার ও আটাবারা** বাঁধ। মিশরে আরও কতকগুলো বিখ্যাত বাঁধ হল **লেক নাসের বাঁধ, নাগ হামাদি, ইসনা, অ্যাসিউট**।

বহুমুখী নদী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

- পর্যটন
- জলসেচ
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ
- জলবিদ্যুৎ
- জল পরিবহন
- মাছ চাষ

• নীলনদের অববাহিকা খনিজ সম্পদে তেমন সমৃদ্ধ নয়। তবে কিছু পরিমাণে খনিজ সম্পদ, যেমন- ম্যাঙ্গানিজ, ফসফেট্স, আকরিক লোহা, খনিজ লবণ ইত্যাদি মিশর এবং সুদান থেকে পাওয়া যায়।

• নীলনদের অববাহিকায় উপযুক্ত পরিমাণে জলের জোগান কাঁচামালের সহজলভ্যতা, প্রচুর শ্রমিক সুলভ জলবিদ্যুৎ ইত্যাদি কারণে মিশর ও সুদানে বেশ কিছু শিল্প গড়ে উঠেছে। যেমন- বস্ত্রবয়ন, পশম, সিমেন্ট, মোটর গাড়ি ইত্যাদি।

জেনে রাখো

• নীলনদের ধারে কৃষি, শিল্প, যাতায়াত ব্যবস্থা এতটাই উন্নত যে মিশরের বেশির ভাগ মানুষ (৮০%) এখানেই বসবাস করে। বাকিরা আশপাশের মরু অঞ্চলের মরূদ্যান (Oasis) গুলোর ধারে ঘর-বাড়ি বানিয়ে থাকে।

• নীলনদের নিম্ন আববাহিকায় কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া, পোর্ট-সৈয়দ, পোর্ট সুয়েজ ইত্যাদি বিখ্যাত শহর গড়ে উঠেছে।

মিশরের রাজধানী কায়রো এখানকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর, শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র।

নীলনদের অববাহিকা অঞ্চলে মানুষের জীবনে নীলনদের প্রভাব সম্পর্কে আরো তথ্য সংগ্রহ করে সুনির্দিষ্ট ধারণা তৈরি করো।

পৃথিবীর বৃহত্তম উষ্ণ মরুভূমি

সাহারা

পৃথিবীর বৃহত্তম উষ্ণ মরুভূমি হলো আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি। সাহারা মরুভূমি এতটাই বড়ো যে একটা গোটা ইউরোপ মহাদেশ বা আড়াইখানা ভারতবর্ষ ঢুকে পড়তে পারে সেখানে। পাথুরে পাহাড়, বাতাসের আঁকিবুকি কাটা দিগন্ত বিস্তৃত ধু ধু বালির প্রান্তর, উটের দল নিয়ে হেঁটে চলা যাযাবরের জীবনকথা, মরূদ্যান, মাঝে মাঝে কাঁটা গাছ—এই হলো সাহারা।

সাহারা মরুভূমির সীমা

সাহারার ভূমিরূপ

উচ্চতা ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সাহারা মরুভূমি একটি মালভূমি অঞ্চল। প্রাচীন শিলা দ্বারা গঠিত ও বহুদিন ধরে ক্ষয় পাওয়া আহাগ্গর ও টিবেস্টি মালভূমি অপেক্ষাকৃত উঁচু। বাতাস দ্রুত গতিতে প্রবাহিত হয়। গাছপালাহীন প্রান্তরে বাতাস পাথরের গায়ে ধাক্কা খেয়ে নানা নকশা তৈরি করে।

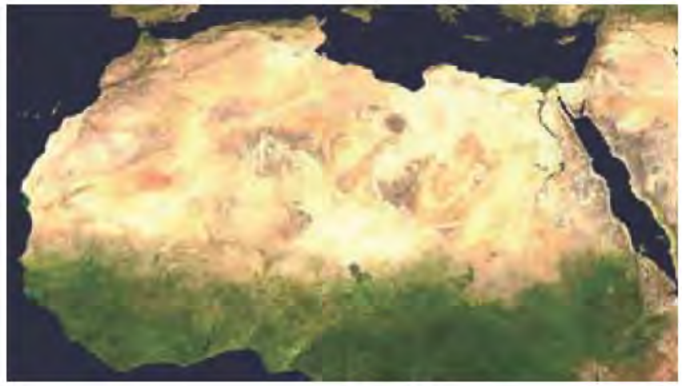

সাহারা মরুভূমির ভূমিরূপ

আর্গ

যে সব অঞ্চলে বালির স্তূপ জমা হয়ে ছোটো পাহাড়ের মতো তৈরি করে তা হলো—**আর্গ**।

হামাদা

যে সব অঞ্চল শক্ত পাথরে ভরতি, বালির অস্তিত্ব চোখেই পড়ে না, তা হলো—**হামাদা**।

ওয়াদি

সাহারার বেশিরভাগ নদীগুলো আটলাস পর্বত ও মধ্য ভাগের উচ্চভূমি থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তবে নদীগুলো বেশিরভাগই শুকনো। শুকনো নদীর খাতগুলো হলো—**ওয়াদি**।

রেগ

যে সব অঞ্চলে বালির সঙ্গে পাথরের টুকরো একসঙ্গে মিশে থাকে তা হলো—**রেগ**।

সাহারা মরুভূমিতে বহু মরূদ্যান দেখা যায়। কুফরা, সিউয়া, টিমিমন, ঘারজাইয়া, বাহারিয়া—সাহারার উল্লেখযোগ্য মরূদ্যান।

সাহারার জলবায়ু

দিনের বেলা : ভীষণ গরম আর বাতাসে জলীয়বাষ্প থাকে না। তাপমাত্রা মাঝে মাঝে ৫৮°সে. পর্যন্ত হয়ে যায়।

গরমকালে সাহারা মরুভূমি থেকে একপ্রকার গরম আর শুকনো বাতাস বয়ে যায়। স্থানীয় ভাষায় একে **খামসিন** নামে ডাকা হয়। গিনি উপকূল অঞ্চলে খামসিনকে বলে **হারমাটান**।

গরমকালে দিনের বেলায় কখনো কখনো প্রবল বালির ঝড় হতে দেখা যায়। তাকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় **সাইমুম**।

লিবিয়ার আল আজিজিয়ায় (ট্রিপোলির দক্ষিণে) সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রা দেখা যায়।

রাতের বেলা : বেশ ঠান্ডা। তাপমাত্রা নেমে যায় ৪°সে। রাত ও দিনের তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত বেশি হওয়া সত্ত্বেও মানুষ নিজেকে মানিয়ে নিয়ে বেঁচে থাকে।

গাছপালা : ক্যাকটাস জাতীয় গাছ দেখা যায়। তবে মরূদ্যানের আশেপাশে ঘাস, খেজুর প্রভৃতি গাছ জন্মাতে দেখা যায়। মরূদ্যানে সামান্য জলের যোগানে ভুট্টা, জোয়ার, বাজরার চাষ হয়। মরূদ্যানের ধারে যারা চাষবাস করে আর যারা মরুভূমিতে পশুর দল, বিশেষত উট নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় জল ও খাবারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় তাদের বলে— **যাযাবর**।

যাযাবরের খাদ্য : যাযাবরেরা উটের দল, ঘোড়া, ছাগল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। পশুর দুধ ও মাংস এদের প্রধান খাদ্য।

সাহারার সম্পদ : **খনিজ তেল** ও **প্রাকৃতিক গ্যাস** পাওয়া যায় **লিবিয়াতে, আলজেরিয়াতে**। এছাড়া **লবণ, কয়লা, আকরিক লোহাও** পাওয়া যায়। তবে অত্যধিক গরমের কারণে এখানে খনিজ সম্পদ আহরণ করাই কষ্টসাধ্য।

উট সাহারার অধিবাসীদের যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম। মরুভূমিতে দল বেঁধে যখন উট চলে তখন তাকে **ক্যারাভান** বলে। তবে বর্তমানে পাকা রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। খনি অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য বিমানবন্দরও তৈরি করা হয়েছে।

সময়ের সাথে সাথে সাহারা

সময়ের সাথে সাথে সাহারা পাল্টাচ্ছে। জায়গায় জায়গায় ঘাস লাগানো হয়েছে। অত্যন্ত চওড়া পাকা রাস্তা পুরোনো উট চলা রাস্তার ওপর দিয়ে চলে গেছে। উঁচু বাড়ি, মসজিদ তৈরি হয়েছে। উটের বদলে ট্রাকের দ্বারা ব্যবসা বাণিজ্য হচ্ছে। সাহারার **তুয়ারেগ** জাতির মানুষেরা বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমণ নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন পশুপালক যাযাবরেরা এখন খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন কেন্দ্রগুলোতে কাজ করে। এরা এখন স্থায়ী ভাবে শহরে বসবাস করে।

বিশ্ব উষ্ণায়ন ও সাহারা

পৃথিবী ক্রমশ উষ্ণ হচ্ছে! কিন্তু পৃথিবীর উষ্ণ হওয়ার জন্য সাহারার কী পরিবর্তন হচ্ছে? আমাদের ভাবনায় এটাই আসে যে সাহারায় আরও গরম বাড়ছে! সাহারা মরুর আরও বিস্তার হচ্ছে ! ঢুকে পড়ছে আশপাশের বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে, গ্রাস করে নিচ্ছে আফ্রিকার সবুজকে! **কিন্তু সত্যিই কি তাই?**

সাহারা মরুভূমিতে পাথরের ওপর কিছু উদ্ভিদ ও জলজ প্রাণীর ছাপ পাওয়া গেছে, যা থেকে বোঝা যায় সাহারা কোনো এক সময় বৃষ্টিবহুল অঞ্চল ছিল। তাহলে কী করে সেই জায়গায় তৈরি হলো মরুভূমি? জলবায়ুগত পরিবর্তনের ফলেই সাহারা গাছপালাযুক্ত ঘন সবুজের জঙ্গল থেকে ধীরে ধীরে শুষ্ক, বৃষ্টিহীন অঞ্চলে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু এখন আবার সাহারায় বৃষ্টি বাড়ছে—সবুজ বাড়ছে। কৃষিজমি দেখা যাচ্ছে, পশুপালন হচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তন সাহারাকে হয়তো ভবিষ্যতে আবার করে তুলবে শস্য শ্যামল।

হাতে কলমে

বিশ্ব উষ্ণায়ন সাহারা মরুভূমি ছাড়াও পৃথিবীর অন্য অঞ্চলে কী কী পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে, সে সম্পর্কে জানার চেষ্টা করো।

ইওরোপ : রাজনৈতিক

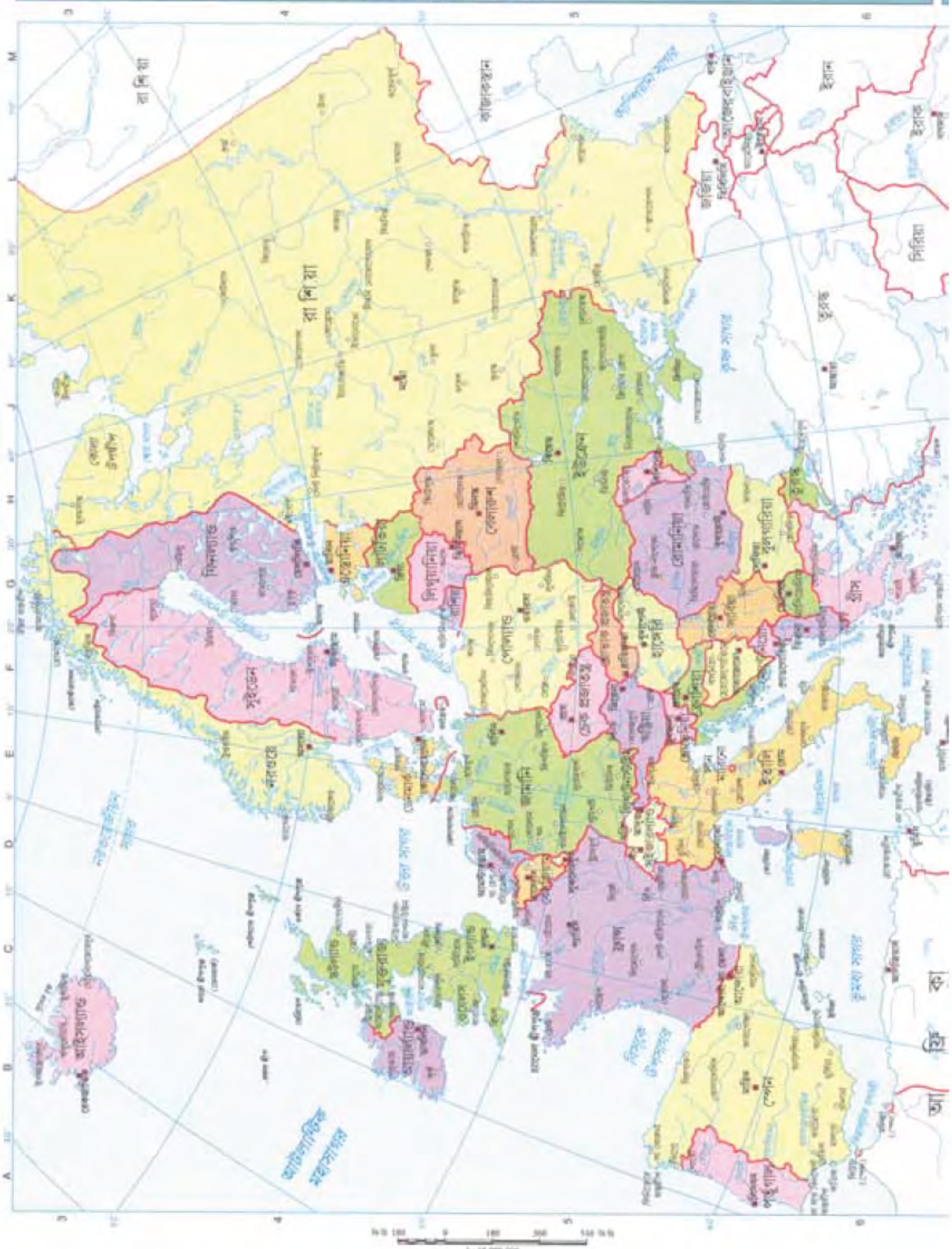

ইউরোপ মহাদেশ

শিল্প বিপ্লব

আল্পস পর্বতমালা

আইফেল টাওয়ার

সমৃদ্ধশালী ইউরোপ

রেনেসাঁ

পিসার মিনার

পৃথিবীর ষষ্ঠ বৃহত্তম মহাদেশ ইউরোপ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি, কৃষি-শিল্প, প্রযুক্তি-গবেষণায় অত্যন্ত উন্নত এবং সমৃদ্ধ।

- ষোড়শ শতাব্দীতে এই মহাদেশের উৎসাহী নাবিকদের ভৌগোলিক অভিযানের কারণেই পৃথিবীর অজানা, অচেনা অনেক দেশ-মহাদেশের সন্ধান পাওয়া যায়।
- শিল্প বিপ্লব এবং আধুনিক যন্ত্র-নির্ভর সভ্যতার বিকাশ এই মহাদেশেই প্রথম হয়েছিল।
- এই মহাদেশের বেশ কিছু দেশ (ইংল্যান্ড, পর্তুগাল, স্পেন , হল্যান্ড, ফ্রান্স) থেকে সারা পৃথিবীতে বাণিজ্য-অভিযান হয়েছিল। ফলে এক সময়ে পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশ এই দেশগুলির উপনিবেশ ছিল।

পিকলুর ডায়েরি

- **আয়তন:** ১ কোটি ৯ লক্ষ বর্গ কিমি.
- **অবস্থান ও সীমা:** ৩৫° উ: অক্ষাংশ— ৭১° উ: অক্ষাংশ এবং ২৪° প: দ্রাঘিমা—৬৫°পূ: দ্রাঘিমা ।

পূর্বে এশিয়া ও কাস্পিয়ান সাগর, পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর, বিস্কে উপসাগর, উত্তর সাগর, উত্তরে সুমেরু মহাসাগর, শ্বেত সাগর, বাল্টিক সাগর এবং দক্ষিণে জিব্রাল্টার প্রণালী, ভূমধ্যসাগর, কৃষ্ণ সাগর।

- **দেশের সংখ্যা :** ৫৪ টি
- **বিখ্যাত শহর :** লন্ডন, আমস্টারডাম, মাদ্রিদ, রোম, বার্লিন।

ইউরোপ মহাদেশের সমৃদ্ধির কারণ

- উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান—সব মহাদেশের সঙ্গে সহজে যোগাযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা
- তিনদিকে জলভাগ—সমভাবাপন্ন নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, অধিবাসীরা কর্মঠ, পরিশ্রমী
- উষ্ণ উপসাগরীয় সমুদ্রস্রোত-উত্তর পশ্চিমের বন্দর গুলো বরফ মুক্ত থাকে।
- সরলবর্গীয় বনভূমির প্রাচুর্য—নরমকাঠ, কাগজ ও কাষ্ঠ শিল্পে উন্নতি।
- খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য, জলবিদ্যুৎ, পারমাণবিক বিদ্যুৎ, উন্নত যোগাযোগ, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য—পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শিল্পোন্নত মহাদেশ।
- বাণিজ্যিকভাবে মৎস আহোরণ, উন্নত কৃষি ব্যবস্থা, মিশ্র কৃষি, খাদ্য শস্য ও পশুপালন।

প্রাকৃতিক পরিবেশ

ইউরোপ মহাদেশ আয়তনে ছোটো হলেও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কোনো অভাব নেই। দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল থেকে উত্তরে উত্তর সাগরের তীরভূমি এবং পূর্বে ইউরাল পর্বত থেকে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত বিভিন্ন প্রান্তে তুষার ঢাকা পর্বত, বিস্তৃত সমভূমি, গভীর পাইনের বন ছড়িয়ে রয়েছে। ইউরোপের বেশির ভাগ অঞ্চল সমভূমি হলেও উঁচু মালভূমি, নিচু ভূমি, পর্বতময় অঞ্চলও রয়েছে।

- দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চলের মাঝে রয়েছে আল্পস পর্বতশ্রেণি। আল্পসের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মঁ-ব্লাঁ (৪৮০৭ মি.) ফ্রান্স-সুইজারল্যান্ড সীমান্তে অবস্থিত। আল্পস থেকে শিরার মতো বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হয়েছে পিরেনিজ (ফ্রান্স-স্পেন সীমান্তে) সিয়েরা নেভেদা, ক্যান্টাব্রিয়ান (স্পেন), অ্যাপেনাইন (ইতালি), ডিনারিক আল্পস (সার্বিয়া, আলবানিয়া), পিন্ডাস (গ্রিস), রোডপ (বুলগেরিয়া, টার্কি), বলকান, ককেশাস, বোহেমিয়া প্রভৃতি পর্বতশ্রেণি। **ককেশাস পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এলবুর্জ (৫৬৪২ মি.) ইউরোপের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ।**

- বহু নদীর উৎপত্তি হয়েছে এই আল্পস পার্বত্য অঞ্চলে। এদের মধ্যে রোন, পো, দানিয়ুব ইত্যাদি নদী দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে। অপরদিকে সীন, রাইন, এলব প্রভৃতি নদী আল্পসের উত্তরের মালভূমি অঞ্চলকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে উত্তরের বিশাল সমভূমি অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। স্পেনের মেসেতা, ফ্রান্সের সেন্ট্রাল ম্যাসিফ, রাশিয়ার ডন ম্যাসিফ এইরকম বিচ্ছিন্ন মালভূমির উদাহরণ। পূর্বে ইউরাল পর্বত থেকে শুরু হয়ে উত্তরের বিশাল সমভূমি রাশিয়া, বেলজিয়াম, পোল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ডের মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে শেষ হয়েছে। এখানকার গড় উচ্চতা ১৮০ মি.।

> **ভেবে লেখো**
>
> যেখান থেকে অনেকগুলো পর্বতমালা চারিদিকে প্রসারিত হয় তাকে কী বলে ?

- পূর্বে ভলডাই (৩০৫ মি.) ও অন্যান্য পাহাড়ি অঞ্চলের উচ্চতা কিছুটা বেশি। এই ভলডাই পাহাড়ি অঞ্চলেই উৎপন্ন হয়েছে ভল্গা, ডন, নিপার প্রভৃতি নদী। এই সমভূমির অনেক জায়গায় আবার হিমবাহের ক্ষয়ের ফলে বা ভূমি ধসের ফলে বড়ো বড়ো হ্রদ তৈরি হয়েছে। যেমন—**ল্যাডোগা (১৮,১৩০ বর্গ কিমি) ইউরোপের বৃহত্তম হ্রদ**। এই সমভূমির উত্তর-পশ্চিমে নেদারল্যান্ডে সমুদ্রের অগভীর

এলাকা ভরাট করে তৈরি করা হয়েছে **পোল্ডারভূমি**।

- ইউরোপের উত্তর পশ্চিমে ফিনল্যান্ড, সুইডেন, নরওয়ে ও আইসল্যান্ডে, প্রাচীন পার্বত্য অঞ্চল দেখা যায়। নরওয়ের ডোভারফেল, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের গ্রাম্পিয়ান এখানকার উল্লেখযোগ্য পর্বত।
- ইউরোপের দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে (ইতালির ভিসুভিয়াস, সিসিলি দ্বীপের এটনা, লিপারি দ্বীপের স্ট্রম্বলি) এবং আইসল্যান্ডে (ক্র্যাফলা, হেকলা) বেশ কয়েকটি আগ্নেয়গিরি দেখা যায়।

স্ট্রম্বলি: ভূমধ্যসাগরের 'আলোকস্তম্ভ'

জানো কী?

ইউরোপের ফিনল্যান্ডে প্রায় ৩৫ হাজারের বেশি হ্রদ থাকার জন্য একে হাজার হ্রদের দেশ বলা হয়।

নদ নদীর ধারণা মানচিত্র

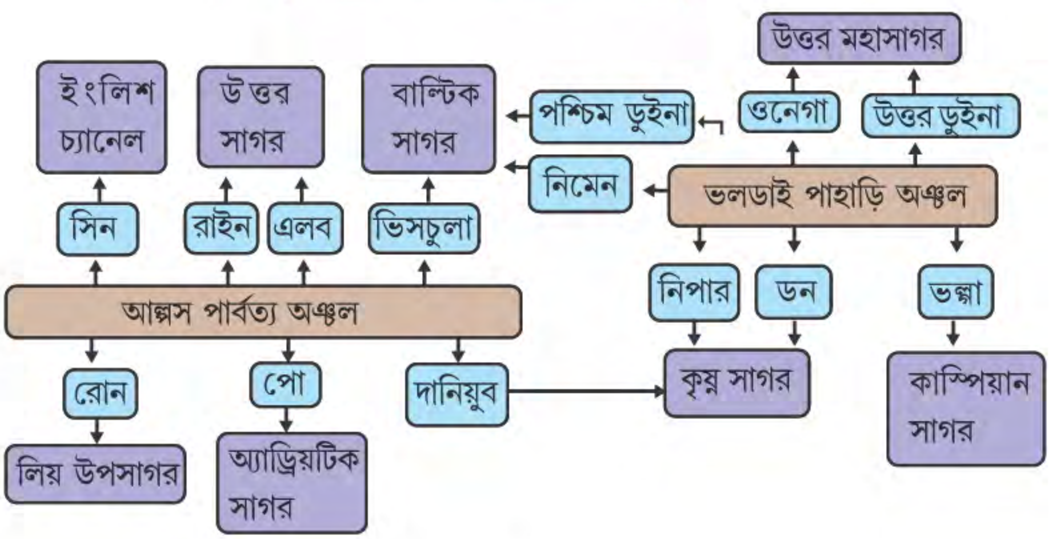

ধারণা মানচিত্র থেকে ঠিক ঠিক লিখে ফেলো

নদীর নাম	উৎস	মোহনা	উপনদীর নাম	বিশেষ বৈশিষ্ট্য
সিন	?	?	ওইস, মারনে	ফ্রান্সের দীর্ঘতম নদী
এলব	?	?	হাভেন, অরজু	
রাইন	?	?	রুঢ়, নিপে অভ্যন্তরীণ জলপথ	ইউরোপের ব্যস্ততম
ভিশচুলা	?	?	বুডা, নিডা, চেক	পোল্যান্ডের দীর্ঘতম নদী
রোন	?	?	আইন	
পো	?	?	টিসিনো	ইতালির দীর্ঘতম নদী
দানিয়ুব	ব্ল্যাক ফরেস্ট পর্বত	?	দ্রাভা, সাভা	শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক নদী
ভল্গা	?	?	ওকা, কামা	ইউরোপের দীর্ঘতম
নিপার	?	কৃষ্ণসাগর	বস	

ইউরোপের ভূমিরূপের সাধারণ ঢাল কোন দিকে বলে মনে হয় এবং কেন?

....

....

জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ

সাধারণভাবে ইউরোপের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ প্রকৃতির। যদিও অঞ্চলভেদে বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। প্রায় সারাবছরই এই মহাদেশের কোনো না কোনো অংশে বৃষ্টিপাত হয়। অক্ষাংশগত কারণে আবার দক্ষিণ থেকে উত্তরে উষ্ণতা ক্রমশ কমতে থাকে। গ্রীষ্মকালে যখন দক্ষিণ-পূর্বাংশে উষ্ণতা থাকে গড়ে ২৭° সে., তখন উত্তর সীমানায় উষ্ণতা হয় ১৪° সে.। এই সময় বায়ুচাপ বলয়গুলি উত্তরে সরে যায় বলে দক্ষিণ ইউরোপে শুষ্ক উত্তর-পূর্ব আয়ন বায়ু এবং বাকি অঞ্চলে আর্দ্র পশ্চিমা বায়ু প্রবাহিত হয়। শীতকালে উষ্ণ উত্তর আটলান্টিক স্রোতের প্রভাবে পশ্চিমাংশের উষ্ণতা ১০° সে. থাকলেও মধ্য-পূর্বাংশে তা যথেষ্ট কমে যায়। আর উত্তর-পূর্ব সীমান্তে তা আরও কমে হিমাঙ্কের অনেক নীচে (-১৪° সে.) নেমে যায়।

দুটো মানচিত্রের মধ্যে কি কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছো ?

উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাতের আঞ্চলিক তারতম্যের ভিত্তিতে ইউরোপকে বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলে ভাগ করা যায়। স্বাভাবিক উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য প্রধানত জলবায়ু নির্ভর। তাই উদ্ভিদ অঞ্চল এবং জলবায়ু অঞ্চলের সীমারেখার মধ্যে মিল পাওয়া যায়।

১. তুন্দ্রা জলবায়ু -তুন্দ্রা উদ্ভিদ : ইউরোপের উত্তরাংশে নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড ও রাশিয়ার উত্তরাংশে বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রায় সারাবছর তীব্র শীতল আবহাওয়া ও তুষার পাতের কারণে ভূমি ৯-১০ মাস বরফাবৃত থাকে। গ্রীষ্মকালে যখন ২-৩ মাস ভূমি বরফমুক্ত থাকে তখন মস, লিচেন ইত্যাদি নানা ধরনের ছোটো ফুলের গাছ জন্মায়।

২. উপমেরু জলবায়ু-সরলবর্গীয় অরণ্য : সুইডেন, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে ও রাশিয়ার কিছু অংশে এই জলবায়ু লক্ষ করা যায়। এখানেও ভূমি ৬-৮ মাস বরফে ঢাকা থাকে। গ্রীষ্মকালে অল্প বৃষ্টিপাত, শীতকালে তুষারপাত এখানকার জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য। এই পরিবেশে পাইন, লার্চ, ফার, বার্চ, অল্ডার প্রভৃতি নরম কাঠের সরলবর্গীয় বনভূমি এখানে গড়ে উঠেছে। এই বনভূমি পূর্বদিকে প্রসারিত হয়ে পৃথিবীর বৃহত্তম তৈগা বনভূমিতে মিশেছে। এখানে গ্রীষ্মকালে ৪-৫ মাস তাপমাত্রা থাকে ১০° সে. । আর শীতকালে ৭-৮ মাস তাপমাত্রা -২৫° সে. থেকে -৩৫° সে. হয়ে যায়।

৩.পশ্চিম ইউরোপীয় জলবায়ু-নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী অরণ্য: উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, পশ্চিম ফ্রান্স, জার্মানির পশ্চিমাংশ, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম এবং নরওয়ের কিছু অংশে এই জলবায়ু দেখা যায়। এখনকার অরণ্যে নরমকাঠের সরলবর্গীয় গাছের সঙ্গে শক্ত কাঠের পর্ণমোচী গাছ পাশাপাশি

জন্মায়। ওক, ম্যাপল, অল্ডার, উইলো প্রভৃতি গাছ এখানে দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা থাকে ১৫° - ২০° সে. এবং শীতকালও বেশ শীতল (৫° সে.)। সারাবছর বৃষ্টি হয়, তবে শীতকালে এর পরিমাণ বেশি (বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১০০-১৫০ সেমি.)।

৪. ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু-ভূমধ্যসাগরীয় অরণ্য : ইউরোপের দক্ষিণাংশে ইতালি, স্পেন, ফ্রান্স, গ্রিস প্রভৃতি দেশের ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল অঞ্চলে এই জলবায়ু দেখা যায়, এখানে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়। জলপাই, ডুমুর, কর্ক, ওক, সিডার প্রভৃতি গাছ দেখা যায়। আঙুর ও কমলালেবু এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। গ্রীষ্মকালীন উষ্ণতা ২১°-২৭° সে. এবং শীতকালীন উষ্ণতা ৫°-১০° সে. । বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪০-৭৫ সেমি।

৫. মহাদেশীয় জলবায়ু-স্টেপ তৃণভূমি : ইউরোপের মধ্য ও পূর্বাংশে রাশিয়া ও ইউক্রেনে এই জলবায়ু দেখা যায়। এখানে বৃষ্টিপাত কম হয় বলে তৃণভূমি তৈরি হয়েছে। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের এই তৃণভূমি **'স্টেপ'** নামে পরিচিত। তবে নদীর ধারে যেখানে জল বেশি পাওয়া যায় সেখানে উইলো, এলম, ম্যাপল প্রভৃতি গাছ জন্মাতে দেখা যায়। গ্রীষ্মকালীন উষ্ণতা ২০°-২২° সে. এবং শীতকালে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে থাকে। বৃষ্টিপাত ২৫-৫০ সেমি.। বর্তমানে স্টেপ অঞ্চলের বেশিরভাগ স্থান পরিষ্কার করে কৃষিকাজ করা হচ্ছে।

★ **ইউরোপের কোন জলবায়ু অঞ্চলে জনবসতি সবচেয়ে বেশি এবং কোন জলবায়ু অঞ্চলে সবচেয়ে কম হতে পারে বলে তোমার মনে হয় ?**

✍--

রূঢ় শিল্পাঞ্চল

জার্মানির রাইন ও তার দুই উপনদী রূঢ় ও লিপের সংযোগস্থলে কয়লাখনিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল, **'রূঢ় শিল্পাঞ্চল'**।

এই শিল্পাঞ্চলের উত্তরে লিপে নদী, দক্ষিণে রূঢ় ও পশ্চিমে রাইন নদী প্রবাহিত হয়েছে। আর পূর্ব সীমানায় রয়েছে সয়ারল্যান্ড উচ্চভূমি।

অঞ্চলটির আয়তন প্রায় ৪,৬০০ বর্গ কিমি।।

রূঢ় শিল্পাঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ

- হিমবাহ ও নদীর সঞ্চয়কার্যের ফলে এই অঞ্চল সৃষ্টি হয়েছে। ভূপ্রকৃতি সামান্য ঢেউ খেলানো। হিমবাহের সঞ্চয় কার্যের ফলে ছোটো ছোটো টিলা দেখা যায়। সমগ্র অঞ্চলটির গড় উচ্চতা ২৪০ মিটারের মতো।

- রূঢ় অঞ্চলের প্রধান নদী রাইন নদী। এই নদী দক্ষিণে কোলন শহরের কাছে রূঢ় অঞ্চলে প্রবেশ করে পশ্চিম সীমানা বরাবর প্রবাহিত হয়েছে। রূঢ় এবং লিপে এই দুটি নদী এই অঞ্চলের পূর্বদিক থেকে প্রবাহিত হয়ে এসে রাইন নদীতে মিশেছে। নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে উর্বর পলিমাটি দেখা যায়। আর দক্ষিণে চার্নোজেম ও উত্তরে পড্‌সল মাটি দেখা যায়।

- রূঢ় অঞ্চলের জলবায়ু শীতল নাতিশীতোষ্ণ প্রকৃতির। গ্রীষ্মকালে উষ্ণতা মাঝারি এবং শীতকাল বেশ শীতল। পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে সারাবছর ধরেই এখানে বৃষ্টিপাত হয়। যদিও পরিমাণে তা কম। গ্রীষ্মকালীন গড় উষ্ণতা ১৫°-২০° সে. শীতকালীন গড় উষ্ণতা ২°-৫° সে. এবং গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫০-৭০ সেমি.।

- কৃষি, শিল্প ও বসতির প্রয়োজনে এখানে বনভূমির সংখ্যা অনেক কমে গেছে। তবে শিল্পাঞ্চলের দূষণ রোধের জন্য কিছু সংরক্ষিত বনভূমি রয়েছে। পরিকল্পিত বনভূমিও সৃষ্টি করা হয়েছে। এই সব বনভূমিতে পাইন,বার্চ,ওক, বিচ, ফার জাতীয় গাছ দেখা যায়।

রূঢ় শিল্পাঞ্চলের অর্থনৈতিক পরিবেশ

- প্রধান খনিজ সম্পদ কয়লা, এই শিল্পাঞ্চলের প্রাণ। রাইন, লিপে ও রূঢ় নদীর মাঝের অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে অ্যানথ্রাসাইট ও বিটুমিনাস জাতীয় উৎকৃষ্ট মানের কয়লা পাওয়া যায়। যা এই অঞ্চলের শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এছাড়া বেশ কিছু জায়গায় খনিজ তেলও পাওয়া যায়।

- এই অঞ্চলের রেল, সড়ক ও জলপথ পরিবহন ব্যবস্থা খুব উন্নত। শিল্প ও পরিবহনের উন্নতির কারণে সমগ্র অঞ্চলটি বেশ ঘনবসতিপূর্ণ। দক্ষিণ থেকে উত্তরে নিরবচ্ছিন্নভাবে জনবসতি দেখা যায়। রাইন নদীর পূর্বদিকে রাইন-হার্নে-ডর্টমুন্ড খাল ও উত্তরে লিপে খাল কাটা হয়েছে। নদীগুলি এই খালপথের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত এবং সারাবছর নৌ-পরিবহনের উপযুক্ত। রূঢ় অঞ্চলের উত্তরে অবস্থিত হামবুর্গ বন্দর এই অঞ্চলের শিল্পোন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

- প্রধানত শিল্পাঞ্চল হওয়ার কারণে এখানে কৃষির পরিমাণ ও কৃষির গুরুত্ব দুটোই কম। শহরের পাশাপাশি অঞ্চলে মিশ্র কৃষি পদ্ধতিতে গম, যব, আলু, ওট, ফল, ফুল চাষের সঙ্গে পশুপালন এবং দুধ, মাংস উৎপাদন করা হয়।

রূঢ় অঞ্চলের শিল্প ও শিল্পকেন্দ্র

শিল্পের নাম	শিল্পকেন্দ্রের নাম
লৌহ ইস্পাত শিল্প	ডুইসবার্গ, মুলহাইম, এসেন, ডর্টমুন্ড, বখুম, গেলসিনকিরখেন, হ্যাম, হ্যাটিনজেন
ইঞ্জিনিয়ারিং, রেলইঞ্জিন, মোটরগাড়ি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।	ডর্টমুন্ড, বখুম, এসেন, ডুইসবার্গ, গেলসিনকিরখেন, হ্যাম, হ্যাগেন, গ্লাডবাক
রাসায়নিক (রং ওষুধ, কীটনাশক, বিস্ফোরক দ্রব্য)	ডুইসবার্গ, হ্যাম, বট্রপ, রেকলিং, হার্ডজেন, গ্লাডবাক
সিমেন্ট শিল্প	এসেন, গেলসিনকিরখেন
বস্ত্রবয়ন শিল্প	এসেন, মোঁচেন, গ্লাডবাক, আচেন, ডুইসবার্গ, বট্রপ
বৈদ্যুতিক শিল্প	আচেন, বখুম, ডর্টমুন্ড
কাঁচ শিল্প	গেলসিনকিরখেন
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ	ডুসেলডর্ফ, ডুইসবার্গ

কোনো অঞ্চলে শিল্প স্থাপনের জন্য কী কী প্রয়োজন হয় বুঝে নাও।

- জমি
- শ্রমিক
- মূলধন
- কাঁচামাল
- পরিবহন
- বাজার
- জল
- শক্তি সম্পদ
- সরকারি নীতি

লন্ডন অববাহিকা

দীপাদের স্কুলে ভূগোল ক্লাসে আজ 'লন্ডন অববাহিকা' পড়ানোর কথা। তার আগে দীপারা নিজেদের মধ্যে লন্ডন সম্পর্কে আলোচনা করছিল। মলি বলল, 'লন্ডন শহর ইংল্যান্ডে অবস্থিত। আর ইংল্যান্ড হল সেই দেশ যেখান থেকে ইংরেজরা ভারতে এসেছিল।' তিতলি বলল, 'কলকাতা শহর যেমন গঙ্গা নদীর ধারে অবস্থিত, তেমনি লন্ডন শহরটা টেমস নদীর ধারে গড়ে উঠেছে।' মুনাই বলল, 'লন্ডন শহরের কাছে গ্রিনিচের ওপর দিয়ে মূলমধ্যরেখা গেছে।'

ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডন প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

একনজরে লন্ডন অববাহিকা

- **অবস্থান:** ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য।
- **সীমানা:** উত্তরে চিলটার্ন উচ্চভূমি, দক্ষিণে নর্থ ডাউনস্ উচ্চভূমি, পশ্চিমে রেডিং শহর এবং পূর্বে উত্তর সাগর।
- **আয়তন:** প্রায় ৭৭৬০ বর্গ কিমি।
- **অববাহিকার আকৃতি :** মাটির সরার মতো।
- **প্রধান নদী:** টেমস।
- **প্রধান বিমানবন্দর :** হিথ্‌রো।

লন্ডন অববাহিকার প্রাকৃতিক পরিবেশ

- ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত টেমস নদীর উভয় তীরে চিলটার্ন ও নর্থ ডাউনস নামক দুটো পর্বতের মধ্যবর্তী নিম্ন সমতলভূমিতে এই লন্ডন অববাহিকার অবস্থান। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডন এই অববাহিকায় অবস্থিত, তাই এর নাম **লন্ডন অববাহিকা**।

লন্ডন অববাহিকা অঞ্চলের প্রায় মাঝখান দিয়ে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে টেমস নদী বয়ে চলেছে। টেমস নদীর মোহনার কাছাকাছি বা লন্ডন অববাহিকার পূর্বদিকে বিশেষ কোনো উচ্চভূমি দেখা যায় না।

তবে উৎস অঞ্চলে, বিশেষত উত্তর, পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিকে চিলটার্ন, হোয়াইট হর্স ও নর্থ ডাউনস নামে তিনটি উচ্চভূমি লক্ষ করা যায়। অতীতে এই উচ্চভূমি অঞ্চলের মাঝখানের অংশ বসে গিয়ে এই নিম্নভূমির সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তীকালে টেমস ও তার বিভিন্ন উপনদীর সঞ্চয়কার্যের ফলে এই লন্ডন অববাহিকা অঞ্চলের উদ্ভব হয়েছে।

বলতে পারো?

সমগ্র লন্ডন অববাহিকার ঢাল কোনদিক থেকে কোনদিকে?

- লন্ডন অববাহিকা অঞ্চলের প্রধান নদী টেমস। এই নদী পশ্চিমে কটস্ওল্ডস্ পাহাড়ে উৎপন্ন হয়ে হোয়াইট হর্স ও চিলটার্ন পর্বতের মধ্যবর্তী গোরিং গ্যাপের মধ্য দিয়ে লন্ডন অববাহিকায় প্রবেশ করেছে। পরে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে উত্তর সাগরে গিয়ে মিশেছে। টেমসের প্রধান উপনদীগুলোর মধ্যে লি, রোডিং, ওয়ে, মোল প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উষ্ণতা : গ্রীষ্মকালীন ১৮°-২০° সে.
শীতকালীন ৩°-৫° সে.
বৃষ্টিপাত : ৬০-৭৫ সেমি.

- লন্ডন মানেই সারাবছর মেঘলা আকাশ, ঝিরঝিরে বৃষ্টি, শীতল ও স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া। পাশের সমুদ্র দিয়ে প্রবাহিত উষ্ণ স্রোতের প্রভাবে শীতকালীন উষ্ণতা খুব কমে না। পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে এখানে সারা বছরই বৃষ্টিপাত হয়, যদিও এর পরিমাণ কম।
- ঘন জনবসতি, শহরায়ন ও শিল্পায়নের কারণে এখানকার বনভূমির পরিমাণ খুবই কম। তবে উচ্চভূমি ও পাহাড়ের গায়ে কিছু ওক, বার্চ, অ্যাশ, লক, পাইন বিচ প্রভৃতি গাছের বনভূমি দেখা যায়।

লন্ডন অববাহিকার অর্থনৈতিক পরিবেশ

- বসতি ও শিল্পের প্রয়োজনে লন্ডন অববাহিকার বেশিরভাগ জমি ব্যবহৃত হয়। তবু স্থানীয় চাহিদা মেটানোর জন্য এখানে কিছু কিছু অঞ্চলে উন্নত যান্ত্রিক পদ্ধতিতে মিশ্র কৃষির মাধ্যমে কৃষিকাজ করা হয়ে থাকে। এখানকার কৃষির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো প্রচুর পরিমাণে সবজি চাষ। বিপুল শহরবাসীর খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য ছোটো ছোটো খামারে ফল ও

শাকসবজি উৎপাদন করে ট্রাকে করে শহরে পাঠানো হয়। একে **ট্রাক-ফার্মিং** বলে।

নদী উপত্যকায় গম, যব, ভুট্টা আর চিলটার্ন ও ডাউনসের উচ্চভূমিতে মিশ্র কৃষি পদ্ধতিতে ওর্চ ও আলুর সঙ্গে পশুখাদ্য হিসাবে হে, ক্লোভার ঘাসের চাষ করা হয়। পাশাপাশি উত্তর সাগর থেকে প্রচুর মাছও ধরা হয়।

- টেমস নদীর তীরে অবস্থিত লন্ডন শহরটি এখানকার প্রধান শহর, বন্দর এবং শিল্প বাণিজ্য কেন্দ্র। এই অঞ্চলে রেলপথ ও সড়কপথ জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। তাছাড়া লন্ডন যেমন একটি বিখ্যাত নদীবন্দর তেমনি আন্তর্জাতিক বিমানপথেরও কেন্দ্র। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে এখানে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন হয়েছে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণে লন্ডন ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। মানুষের বাসস্থানের অভাব মেটাতে রেডিং, নিউব্যারি, ক্রয়ডন প্রভৃতি অনেক শহর গড়ে উঠেছে।

লন্ডন অববাহিকার শিল্প ও শিল্পকেন্দ্র	
ইঞ্জিনিয়ারিং	গিলফোর্ড
মোটরগাড়ি নির্মাণ	লুটন, অক্সফোর্ড
জাহাজ মেরামতি	চ্যাথাম
বিমান ও বিমান যন্ত্রাংশ	রিডিং, হ্যামেল হাম্পস্টেড
বৈদ্যুতিক ও কৃষিযন্ত্র	রেডিং, নিউব্যারি
ছাপাখানা বা মুদ্রণ	ওয়াচফোর্ড
কাগজ	পারফ্লিক্ট, নর্থফ্লিক্ট, ডার্টফোর্ড
রাসায়নিক, দেশলাই	লন্ডন
তথ্য প্রযুক্তি, বিস্কুট	রেডিং
ডেয়ারি ও ময়দা	লিচেস্টার, এসেক্স

লন্ডন শহর পশম, চা, রবার ইত্যাদি পণ্যের একটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে খ্যাত। টেমস নদীর খাঁড়ি মুখে অবস্থিত লন্ডন বৃহত্তম **পুনঃরপ্তানি বন্দর**। এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের উৎপাদিত দ্রব্য এখানে আসে এবং ক্রয় বিক্রয়ের পর এই বন্দর দিয়ে অন্যান্য দেশে রপ্তানি করা হয়।

পোল্ডারভূমি

একটা ছোট্ট দেশের ছোট্ট ছেলের গল্প। নাম ছিল তার হান্স। একদিন হান্স সন্ধের সময় রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ তার চোখ পড়ল রাস্তার পাশের উঁচু দেয়ালের গায়ের একটা ফাটল দিয়ে জল চুঁইয়ে পড়ছে। হান্সের বুকের ভেতরটা নিমেষে আতঙ্কে শিউরে উঠল আসন্ন বিপদের কথা ভেবে। ফাটলটা আরেকটু বড়ো হলেই ও পাশের সমুদ্রের জল হু হু করে গ্রামে ঢুকে পড়বে। আর ভাসিয়ে নিয়ে যাবে গ্রামের পর গ্রাম। তাই কোনো কথা না ভেবে হান্স তার হাতটা মুঠো করে ঢুকিয়ে দিল বাঁধের ফাটলের মধ্যে এবং ওই ভাবেই বসে রইল। রাতের দিকে তার বাবা মা আর গ্রামের লোকজন খুঁজতে খুঁজতে তাকে ওই ভাবে বসে থাকতে দেখতে পেল। তারপর তারা যখন জানতে পারল যে হান্স কী ভাবে তাদের গ্রামকে রক্ষা করেছে তখন সবাই হান্সকে জড়িয়ে ধরল আর তার বীরত্বের জন্য খুব প্রশংসা করল। এই সুন্দর গল্পটা তো অনেকেরই জানা। জানো এই হান্স কোন দেশের ছেলে? হল্যান্ড বা নেদারল্যান্ডের। আর যে অঞ্চলকে সে রক্ষা করেছিল তা হলো **পোল্ডারভূমি**।

পোল্ডারভূমি কী?

আসলে নেদারল্যান্ড দেশটা খুব ছোটো। তাই কৃষি ও অন্যান্য কাজের জন্য জমিরও খুব অভাব। এই সমস্যা দূর করার তাগিদে দেশের উত্তর পশ্চিমে জুইডার জি উপসাগরের বিশাল অগভীর জলভাগে উঁচু কংক্রিটের বাঁধ দিয়ে মাটি ভরাট করে নতুন ভূমি তৈরি করা হয়েছে। সমুদ্র থেকে উদ্ধার করা এইসব নীচু সমতল ভূমিকে **পোল্ডারভূমি** বলে। নেদারল্যান্ডে একাদশ শতাব্দীতে প্রথম পোল্ডারভূমি তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। আগে তা করা হতো প্রাচীন পদ্ধতিতে। এখন প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির সাথে সাথে এই কাজে আধুনিকতার ছোঁয়া এসেছে। নেদারল্যান্ডে প্রায় ৩ হাজারের বেশি ছোটো

বড়ো পোল্ডার রয়েছে। এদের মধ্যে **জুইডার জি** হলো সবচেয়ে বড়ো প্রকল্প। এছাড়া জিল্যান্ড, জিপে, জুইডপ্লাস, আনা পাওলোনা, প্রিন্স আলেকজান্ডার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পোল্ডারভূমি কীভাবে তৈরি করা হয়?

প্রথমে অগভীর জলাভূমি বা সাগরের কিছু অংশ চারিদিকে মাটি বা কংক্রিটের বাঁধ দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। এই বাঁধের ভিতরে জলনিকাশী চক্র খাল থাকে। এরপর এই ঘেরা জলাভূমি পাম্পের সাহায্যে কাদাজলে ভরাট করা হয়। জলাভূমির তলদেশে পলি থিতিয়ে যাওয়ার পর ওপরের জল পাম্পের সাহায্যে খাল দিয়ে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। তারপর পলি শুকিয়ে গেলে ওই জমিকে বেশ কয়েক বছর ফেলে রাখা হয় লবণমুক্ত করার জন্য। অবশেষে জমিকে কৃষিকার্যের উপযুক্ত করে তোলার জন্য সেখানে বেশ কয়েক বছর বিভিন্ন পশুখাদ্যের (হে, ক্লোভার) চাষ ও পশুপালন করা হয়। পরে জমি কৃষির উপযুক্ত হলে বীট, ওট, সূর্যমুখী, টিউলিপ প্রভৃতি শস্য ও ফুলের চাষ শুরু হয়।

পোল্ডারভূমির প্রাকৃতিক পরিবেশ

পোল্ডারভূমি হলো সমুদ্র থেকে উদ্ধার করা নিম্ন সমতলভূমি। প্রধানত আইসেল, মাস এবং রাইন নদীর মধ্যবর্তী ব-দ্বীপের নীচু অংশে পোল্ডারভূমি গড়ে উঠেছে। সমগ্র পোল্ডার অঞ্চলকে ভূমির ব্যবহার অনুযায়ী ৩ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—উত্তর ও উত্তর পূর্বে গ্রোনিং এন, ফ্রিজল্যান্ড ও ওভারিসেল, পশ্চিম ও মধ্যভাগে নুর্ড হল্যান্ড ও ডর্টরেচট এবং দক্ষিণে জুইড হল্যান্ড। এখানকার কোনো কোনো এলাকা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০ ফুটেরও নীচে অবস্থিত। বৃষ্টিপাতের ফলে জল জমলে তা পাম্প করে নিকাশি খালে ফেলে দেওয়া হয়। এখানকার বেশিরভাগ জায়গায় সমুদ্রের কাদামাটি দেখা যায়।

- এই অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে রাইন ও তার কয়েকটি উপনদী, যেমন—লেক, ভাল, মাস প্রবাহিত হয়েছে। এই নদীগুলির ধারে পলিমাটি দেখা যায়।

- পোল্ডারল্যান্ড শীতল নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত। তবে উষ্ণ উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রস্রোত এই অঞ্চলের পাশ দিয়ে বয়ে যায় বলে এখানকার জলবায়ু **সমভাবাপন্ন** অর্থাৎ শীতকাল খুব শীতল নয় (গড় তাপমাত্রা ৩° সে.) আবার গ্রীষ্মকালও খুব তীব্র নয় (গড় তাপমাত্রা ১৬° সে.)। পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে এখানে সারাবছরই বৃষ্টি হয়। তবে এর পরিমাণ খুব কম (বার্ষিক গড়ে ৭০ সেমি.)। এখানে ওক, বার্চ ইত্যাদি বৃক্ষ এবং তৃণভূমির প্রাধান্য দেখা যায়।

পোল্ডারভূমির অর্থনৈতিক পরিবেশ

- নতুন পোল্ডারগুলিতে জমির লবনাক্ততা কমানোর জন্য হে, ক্লোভার প্রভৃতি ঘাসের চাষ করা হয়। গম, ওট, যব, রাই, আলু প্রভৃতি চাষ করা হয় পুরোনো লবণমুক্ত জমিতে। এখানকার বেশিরভাগ খামারগুলিতে মিশ্রকৃষি পদ্ধতিতে চাষের কাজ করা হয়। এখানকার বিস্তীর্ণ জমিতে নানারঙের টিউলিপ, কসমস, গ্ল্যাডিউলি প্রভৃতি ফুলের চাষ করা হয়। আবার শীতল ও কম আলোযুক্ত অঞ্চলে গ্রিনহাউস বা কাঁচের ঘরে সবজির চাষ করা হয়।

- পোল্ডারভূমির শিল্প ও পরিবহন ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত। চক্রখালগুলিও পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হয়। তবে খনিজ সম্পদের বিশেষ অভাব রয়েছে। গ্রোনিয়েন অঞ্চলে প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়। আর **দি হেগ** এর কাছে খনিজ তেল পাওয়া যায়। আমস্টারডাম, রটারডাম, গ্রোনিয়েন, হার্লেম, লেভেন, ইজমুইডেন, দি হেগ, ফ্লাশিং প্রভৃতি শহরগুলিতে লৌহ-ইস্পাত, পেট্রো-রাসায়নিক, জাহাজ নির্মাণ, ডেয়ারি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, কাগজ, চামড়া, প্রসাধনী প্রভৃতি শিল্প গড়ে উঠেছে।

- কৃষি, শিল্প ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির কারণে পোল্ডারভূমির জনবসতি খুব ঘন। এখানকার প্রধান শহর আমস্টারডাম নেদারল্যান্ডের রাজধানী এবং বিখ্যাত বন্দর। হীরে কাটা ও পালিশ শিল্পের জন্যও আমস্টারডাম পৃথিবী বিখ্যাত।

তোমার পাতা

তোমার পাতা

সপ্তম শ্রেণি

নমুনা প্রশ্নপত্র

১। বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

সঠিক উত্তর নির্বাচন করো :—

(ক) অনুসূর অবস্থান উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্ম/শীত/শরৎ/বসন্ত ঋতুতে হয়।

(খ) এশিয়া ও ইউরোপের মাঝে রয়েছে ইউরাল পর্বত/লোহিত সাগর/সুয়েজ খাল/আল্পস পর্বত।

২। নৈর্ব্যাক্তিক প্রশ্ন/অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

(i) শূন্যস্থান পূরণ করো :—

(ক) নিরক্ষরেখার সমান্তরালে বৃত্তাকার কল্পিত রেখাগুলি হলো _________________।

(খ) এশিয়ার দীর্ঘতম নদীর নাম হলো _________________।

(ii) শুদ্ধ/অশুদ্ধ লেখো : —

(ক) ২১ জুন তারিখে পৃথিবীর সর্বত্র দিনরাত্রি সমান হয়।

(খ) ১৯৮৪ সালে ভারতের ভুপালে গ্যাস দুর্ঘটনা ঘটেছিল।

(iii) স্তম্ভ মেলাও : —

বামদিক	ডানদিক
মূলমধ্যরেখা	মিলিবার
বায়ুচাপ	জলপ্রপাত
নদীর ক্ষয়কার্য	গ্রিনিচ

(iv) এক কথায় উত্তর দাও :—

(ক) নিম্নপ্রবাহে নদীর প্রধান কাজ কী?

(খ) একটি তেজস্ক্রিয় দূষকের নাম বলো?

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন [প্রতিটি প্রশ্নের মান ২]

নীচের প্রশ্নগুলি উত্তর দাও (অনধিক দু-তিনটি বাক্য)

(ক) আন্তর্জাতিক নদী বলতে কী বোঝ?

(খ) O P E C কী?

৪। সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ৩)

নীচের প্রশ্নগুলি উত্তর দাও (অনধিক ছটি বাক্য)

(ক) অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার পার্থক্য করো।

(খ) জলদূষণ প্রতিরোধে তুমি কী কী করতে পারো?

৫। ব্যাখ্যামূলক উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ৫)

নীচের প্রশ্নগুলি উত্তর দাও (অনধিক দশটি বাক্য)

(ক) উত্তর গোলার্ধে কীভাবে গ্রীষ্মকাল হয় তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো।

(খ) বায়ুচাপের তারতম্যের কারণগুলি ব্যাখ্যা করো।

(গ) ভঙ্গিল পর্বত ও স্তুপ পর্বতের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

৬। পৃথিবীর রেখা মানচিত্রে নিম্নলিখিতগুলি প্রতীক ও চিহ্নসহ বসাও (প্রতিটির মান ১)।

(ক) হিন্দুকুশ পর্বতশ্রেণি (খ) কঙ্গো নদী (গ) সাহারা মরুভূমি (ঘ) কৃষ্ণসাগর (ঙ) টোকিও শহর।

ওপরের নমুনা ছাড়াও অন্যান্য ধরনের প্রশ্ন দেওয়া যেতে পারে। যেমন—

- নীচের রেখাচিত্রে পৃথিবীর অবস্থান, অবস্থানের তারিখ, সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব উল্লেখ করে খাতায় লেখো।

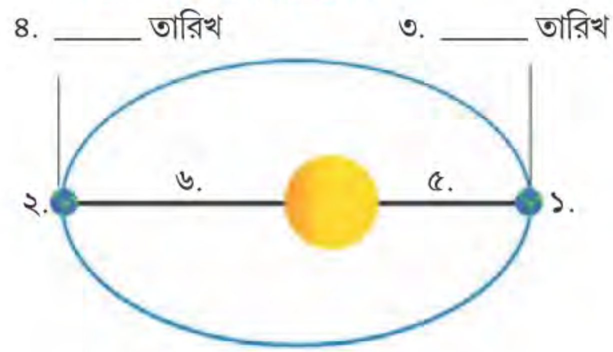

- নীচের ছবিটি শনাক্ত করো। এই ভূমিরূপটি নদীর প্রবাহের কোন পর্যায়ে দেখা যায় লেখো।

শব্দছক সমাধান, শব্দের ধাঁধা, ধারণা মানচিত্র তৈরি, তথ্য মৌচাক পূরণ, বেমানান শব্দ শনাক্তকরণ (Odd one out), ভুল সংশোধন, 'আমি কে' (যেমন— আমি মাত্রাহীন 'ব' অক্ষরের মতো দেখতে ভূমিরূপ। আমি কে?) ইত্যাদি ধরনের প্রশ্ন।

সপ্তম শ্রেণির বাৎসরিক পাঠ্যসূচি বিভাজন

পর্ব -I	পর্ব - II	পর্ব - III
পাঠ একক	পাঠ একক	পাঠ একক
১. পৃথিবীর গতি ।	১. ভূমিরূপ।	১. জল দূষণ।
২. ভূপৃষ্ঠের কোনও স্থানের অবস্থান নির্নয়।	২. নদী।	২. মাটি দূষণ।
৩. বায়ুচাপ।	৩. শিলা ও মাটি।	৩. ইউরোপ মহাদেশ।
৪. এশিয়া মহাদেশ।	৪. আফ্রিকা মহাদেশ।	

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ তৃতীয় পর্বভিত্তিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দেশিত পাঠ একক ছাড়াও প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব থেকে যথাক্রমে 'পৃথিবীর গতি, ভূপৃষ্ঠের কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয়, বায়ুচাপ, ভূমিরূপ, নদী' পাঠ এককগুলি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

তৃতীয় পর্বভিত্তিক মূল্যায়নে ৫ নম্বর মানচিত্র চিহ্নিতকরণ (পৃথিবীর মানচিত্রে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির অন্তর্ভূক্ত বিষয়) আবশ্যিক করতে হবে।

শিখন পরামর্শ

সপ্তম শ্রেণির এই ভূগোল বইটি শুধুমাত্র একটি বই নয়। বইটিতে শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতা ও তার নিজস্ব চিন্তা চেতনার উন্মেষ ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ২০১৪ শিক্ষাবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি কোণে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী যাতে বইটির রসাস্বাদন করতে পারে তার জন্যই এই প্রয়াস।

শিক্ষক/শিক্ষিকার প্রতি—

- প্রাকৃতিক ও আঞ্চলিক ভূগোল বিভাগের প্রতিটি অধ্যায়ে মূল বিষয়ের ধারণা স্পষ্ট করার জন্য প্রচুর ধারণা মানচিত্র, আলোকচিত্র, সহজ মানচিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিটি শিক্ষার্থীর নিজস্ব অভিজ্ঞতা, অনুমান, সংস্কার, বিশ্বাসকে কাজে লাগাতে হবে।

- শিক্ষার্থীরা যখন আলোচনা করে সিদ্ধান্তে আসবে, আপনি মূল বিষয়ে প্রবেশ করবেন। প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর বিষয়গত ধারণা পরিষ্কার হয়েছে কিনা তা জানাবার পথ তৈরি করতে হবে। প্রশ্ন করে তাকে অপ্রস্তুত করে নয়, বরং গল্পের ছলে বা খেলার ছলে কাজটা করতে হবে।

- বইটিতে 'অনুসন্ধান', 'সমীক্ষা', এবং 'হাতে কলমে'র উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর নিজস্ব পরিবেশ সচেতনতা এবং মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করা। এই প্রসঙ্গে অন্য কোনো উদ্ভাবনী পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করানো যেতে পারে।

- নিরবছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন করার জন্য নিজস্ব নোট-খাতা তৈরি করবেন। সেখানে শিক্ষার্থীর নামের সঙ্গে দুটি বা তিনটি পৃষ্ঠা রাখবেন। তাতে প্রতিদিন কিছু মন্তব্য লিখবেন। মন্তব্যগুলি একমাস বা দুমাস অন্তর অভিভাবক/অভিভাবিকার সঙ্গে আলোচনা সভায় আলোচনা করবেন।

- আঞ্চলিক ভূগোল বিষয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে সব জানার বিষয়গুলো রাখা সম্ভব হয়নি। তথ্য বিশ্লেষণের দিকে জোর দেবেন। শিক্ষার্থীরা তথ্য, ছবি সংগ্রহ করবে, দলগত ভাবে শ্রেণিকক্ষে তথ্য ও ছবির কোলাজ তৈরি করে মূল বিষয় অনুধাবন করবে।

- আপনার সক্রিয় সহায়তা ছাড়া শিক্ষার্থীরা শিখনস্তর অতিক্রম করতে পারবে না ঠিকই, তবে শ্রেণিকক্ষে/শ্রেণিকক্ষের বাইরে আপনিই 'মুখ্য'—এই ভাব প্রদর্শন কখনই করবেন না। শিক্ষার্থীকে স্বাধীনতা দেবেন, যাতে সে নিজেই বিষয়গুলোকে বুঝতে পারে।

- পিছিয়ে পড়াদের দিকে বিশেষ নজর দেবেন। যারা খুব সহজে শিখন স্তরে অগ্রসর হতে পারে, শুধুমাত্র তারা বুঝতে পারলেই নিশ্চিন্ত হবেন না। প্রতিটি শিক্ষার্থী যাতে সক্রিয়তা ভিত্তিক শিখনে অংশগ্রহণ করে সেইদিকে নজর দেবেন।

- শিক্ষার্থীদের নিজস্ব পরিবেশেই যে ভূগোলের বিষয়বস্তু লুকিয়ে আছে তা উদ্ভাবন করার কাজে সাহায্য করবেন।

- আশপাশের পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করার জন্য শিক্ষার্থীদের বছরের কোনো একদিন কৃষিক্ষেত্র, জলাশয়, কারখানা বা সম্ভব হলে চিড়িয়াখানা, বনাঞ্চলে নিয়ে যাবেন। তারা ঘুরে এসে নিজস্ব প্রতিবেদন তৈরি করবে।

- শিক্ষার্থীদের কোনো কাজে ত্রুটি হলে সেটাকে ভুল বলবেন না। শিক্ষার্থীর ভুল ধারণাকে সঠিক ধারণায় নিয়ে যেতে হবে বাস্তব অভিজ্ঞতার উদাহরণ দিয়ে।